প্রকাশক ।। রেণুকা সাহা
২০ কেশবসেন স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০৯



মুদ্রক : [illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ।। বিদ্যা [illegible]

[illegible]

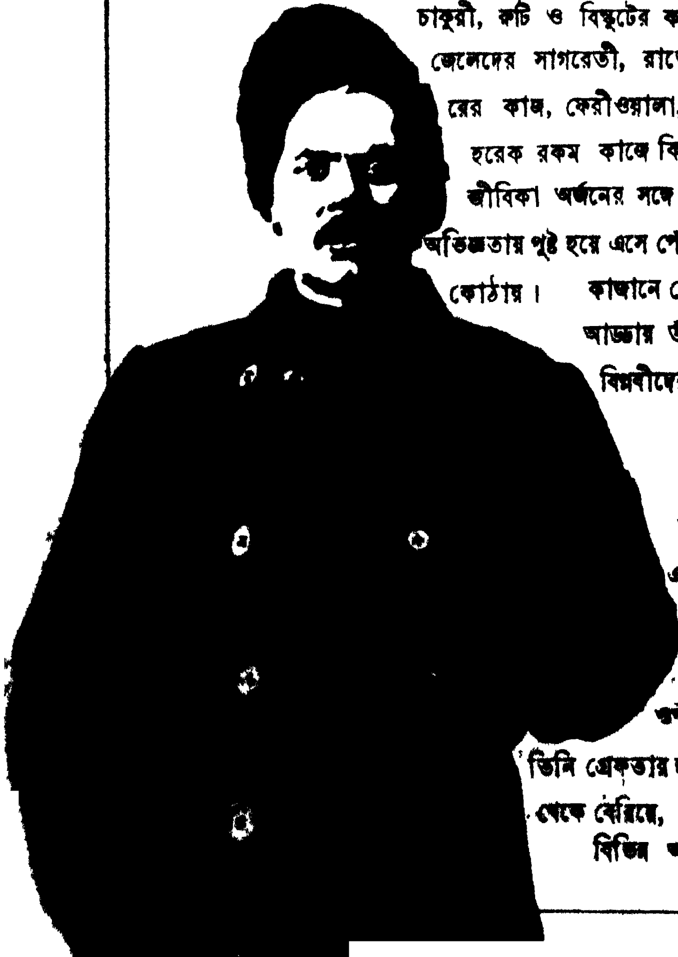


প্রথম প্রকাশ ।। বৈশাখ [illegible]

ম্যাক্সিম্ গর্কী

রুশ ভাষায় 'গর্কী' কথাটার মানে হলো তিক্ত। শিশু বয়স থেকে শোষণ-জর্জরিত মানবজীবনের এত বিচিত্র তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকে জীবন-পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল যে তিনি তাঁর পিতৃদত্ত নাম আলেকসী পেশকভ-এর বদলে তিনি ম্যাক্সিম্ গর্কী নাম গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নিঝনি-নভগরোদ সহরে তাঁর জন্ম। দশ বছর বয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক পেশকভকে জীবিকা সংগ্রহের জন্য পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। পনর বছর বয়সে তিনি এলেন কাজানে। ইচ্ছে, কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। প্রাচীর-ঘেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য কিন্তু তাঁর হলো না। তাঁর শিক্ষা স্বরু হলো দারিদ্র-জর্জরিত বস্তীর বাসিন্দাদের মধ্যে, ভবঘুরে ও কল-কারখানার মজুরদের কাছে। জীপসি জীবন থেকে শুরু করে বাসন মাজার কাজ, জুতো ও বই-এর দোকানে চাকুরী, রুটি ও বিস্কুটের কারখানার মজুরী, জেলেদের সাগরেতী, রাতে রেলচৌকীদারের কাজ, ফেরীওয়ালা, এমনি আরও হরেক রকম কাজে কিশোর পেশকভ জীবিকা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে এসে পৌছলেন যৌবনের কোঠায়। কাজানে দেরেংকভের গুপ্ত আড্ডায় তাঁর পরিচয় হল বিপ্লবীদের সঙ্গে। পড়লেন এ্যাডাম স্মিথ, চার্নিশেভস্কি ও কার্ল মার্কস। এই সময় জারের পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল পেশকভের উপর। কিছুদিন পর তিনি গ্রেফতার হলেন। জেল থেকে বেরিয়ে, তিনি রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে



বেড়ালেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গল্প জীপসিদের জীবন নিয়ে লেখা 'ম্যাকার চুদ্রা' বের হল। এরপর তিনি একে একে লেখেন—এমেলিয়া পিলিয়াই, অভাগা, ইজেরগিল, চেলকাস, মালভা, ফোমা গর্দিয়েভ, ছাব্বিশজন মানুষ ও একজন মেয়ে, মনিব প্রভৃতি—উপন্যাস ও গল্প। বিভিন্ন প্রাদেশিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলোও এই সময়ই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনের তিক্ত সত্যকে তিনি তুলে ধরলেন এইসব গল্পে। এইসব বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার দিকপাল সাহিত্যিক টলষ্টয় ও চেকভের পাশে গর্কী স্থান পেলেন।

গর্কী ভালবাসতেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের। বস্তীর শিশুরা তো দেশ-ভ্রমণ করতে পারে না, পাহাড়পর্বত, সমুদ্র তারা দেখতে পায় না—তাদের জন্য তিনি করলেন নানান জায়গায় ছবির প্রদর্শনী। বস্তীর বয়স্কদের শিক্ষা ও আনন্দ দেবার জন্য খুললেন লাইব্রেরী ও ক্লাব। আবার পুলিশের কড়া নজর পড়ল গর্কীর উপর। এমনি একদিনে গর্কী নিজের চোখে দেখলেন, এক ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের নৃশংস আক্রমণ ও নির্মম অত্যাচার। বিক্ষুব্ধ লেখকের কলম থেকে বের হলো চল্লিশ লাইনের বিখ্যাত 'ঝড়ের পাখীর গান'। সমস্ত রুশদেশ নড়ে উঠলো সে-গানে। এই সময় (১৯০২ সালে) রুশিয়ার সাহিত্য একাডেমীর সভ্য নির্বাচিত হলেন তিনি। কিন্তু জারের পুলিশের হুকুমে সে সভ্যপদ বাতিল হয়ে গেল। পুলিশী হুকুমের প্রতিবাদে চেকভ পদত্যাগ করলেন একাডেমী থেকে। অসুস্থ গর্কীকে পুলিশ গ্রেফতার করল। সারা দেশে জেগে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়। অগ্রনী হলেন টলষ্টয় নিজে। পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হলো—গর্কী মুক্তি পেলেন। এরই মধ্যে শ্রমিকদের সংগ্রাম উঠলো উত্তুঙ্গে, দেশব্যাপি সমস্ত জনগণের প্রতিবাদ বিস্ফূর্ত হোলো বিপ্লবে। ১৯০৫ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সেদিন জারতন্ত্র তাকে তলোয়ার আর কামান বন্দুকের সাহায্যে পরাজিত করলো। গর্কী ছিলেন বিপ্লবের কেন্দ্র স্থলে, বিপ্লবীদেরই একজন। তাঁর বিরুদ্ধে বেরুলো আবার গ্রেফতারী পরোয়ানা। গর্কী রাশিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। রাশিয়ার জারতন্ত্রের অত্যাচার নিপীড়ন এবং বিপ্লব ও বিপ্লবীদের কথা জানালেন তিনি সারা ইউরোপ আর আমেরিকায়। সেখানকার জনগণের সমর্থন চাইলেন। সংগ্রহ করলেন টাকা বলশেভিক পার্টির জন্য। আমেরিকায় বসবাসকালে তিনি সেখানকার জনগণের ভালবাসা পেলেও সেখানকার সরকার তাকে মোটেই পছন্দ করত না। তিনি আমেরিকার ধনতন্ত্রের নিষ্ঠুর রূপ দেখে লিখলেন 'পীত দানবের দেশে' এবং 'রাজাধীরাজ দর্শন'। এই বি[illegible]শ বসবাসকালেই তিনি রচনা করেন 'মা' উপন্যাস এবং তারপর '৯ই জানু[illegible]রী'।

১৯০৭ সালে লণ্ডনে লেনিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

'মা' ঝড় তুললো রাশিয়ায়। যে মাসিক পত্রিকায় 'মা' এর প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাগুলি বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করা হল। দ্বিতীয় খণ্ড বেরুলো তার সারা অঙ্গে সেনসরের নীল পেন্সিলের ক্ষত নিয়ে। বাদ পড়লো অনেক পরিচ্ছদ। তবুও গোপনে ছাপা ছড়িয়ে পড়লো হাজার হাজার বই। সমস্ত দেশে জাগিয়ে দিলো বিপ্লবী চেতনা। মেহনতী সংগ্রামী মানুষ পেলো দিকনির্দেশ, সমাজে নিজেদের অবস্থানকে পেলো খুঁজে। পেলো তাদের সাহিত্যকে।

১৯০৫ সালের গনতান্ত্রিক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে তোড়জোড় চললো শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির সংগঠন বিস্তারের কাজ। তখন সংগ্রামী জনতার দিকনির্দেশিকা হিসাবে কাজ করলো এই 'মা' উপন্যাস। কাপ্রি দ্বীপে তখন গর্কী। লেনিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন—এখন আমরা চাই 'মা'র মতো বই। তারপর একে একে বেরুল, মরদোভিয়ান, নবজাতক, ছেলেবেলা, ভি আই লেনিন, টলষ্টয়ের স্মৃতি, জীবন স্মৃতি, জীবন প্রভাত, ম্যাগনেট, তারা তিনজন, উপন্যাসের গল্প, জনসাধারনের সাহিত্য প্রভৃতি আরও অনেক লেখা।

মা উপন্যাসের নায়ক পাভেল ভবিষ্যতবাণী করেছিল—আমরা সাম্যবাদী। আমরা এই পুরানো অচল সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙবো। নিয়ে আসবো এমন এক নতুন সমাজব্যবস্থা, যেখানে মানুষের এই পৃথিবীতে মানুষ আর শাস্তি পাবে না, হবে না অত্যাচারিত। মানুষের পরিশ্রম দিয়ে উৎপাদিত ঐশ্বর্য্যের উপর থাকবে সমস্ত মেহনতী মানুষের অধিকার···আমরা জয়ী হবই। এই ভবিষ্যত বাণী সফল হল গর্কীর নিজের দেশে, পাভেলরাই তাই করলেন। গর্কী তার উপন্যাসে যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত হল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার আদর্শ রূপ পেলো। গর্কী হলেন অমর কথাশিল্পী। মহান্ গর্কী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জনগনের সঙ্গে থেকে, নতুন সোভিয়েট জীবনের উপরে সাহিত্য রচনায় কাজে নতুন নতুন লেখকদের পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন।

ভারতবর্ষের প্রতিও ছিল তাঁর অসীম দরদ এবং তাঁর বহু প্রবন্ধে তিনি ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লেখনী চালিয়েছেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন গর্কীর মৃত্যু হয়।



স্রষ্টা ও সৃষ্টি

বিশ্বের, শ্রমজীবী মানুষের সবচেয়ে আপন কথাশিল্পী হলেন ম্যাক্সিম্ গর্কী। তাঁর এই 'মা' উপন্যাস পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। এতো জনপ্রিয় উপন্যাস পৃথিবীতে আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ। দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে তা আজও লোকের দাবী রাখছে। এই 'মা'

উপন্যাসের নায়ক পাভেল ভ্লাসব কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়। তিনি বাস্তব জীবনে ছিলেন সশরীরে বিদ্যমান। তাঁর নাম ছিল পীতর জালোমভা। আর তাঁর মা ছিলেন আনা কিরিলোভনা জালোমভা। এই আনা কিরিলোভনাই হচ্ছেন আমাদের 'মা' উপন্যাসের পেলাগয়া নিলভনা ভ্লাসবা। রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার দিকে যারা আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়েছিলেন, মার্কসবাদের প্রচার ও সংগঠন গড়েছিলেন, তাদের মধ্যে পীতর জালোমভা ছিলেন অন্যতম। ঐ সময়ই গর্কী পীতরের নামের সঙ্গে পরিচিত হন। শিল্পনগরী সরমোভোতে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রনী বাহিনীর একজন হয়ে ওঠাতে জারের পুলিসের কাছে পীতর একজন সাংঘাতিক ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।

উনিশশ' দু সালে সরমোভোতে শ্রমিকরা যে জঙ্গী মিছিল বের করেন পীতর ছিলেন তার অন্যতম সংগঠক। জার স্বৈরতন্ত্র গর্কীকে মনে করত তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের একজন 'বিপজ্জনক শত্রু' বলে। তাঁদের উভয়েরই আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পরিচয় সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

উনিশশ' দু সালের সরমোভোর মিছিলে পীতর গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর গর্কী তাঁর মার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নিয়মিত পীতরের খোঁজ খবর নিতেন। বিচারের আগে তিনি পীতরের মার মারফৎ জেলে খবর পাঠান তারা যেন জারের আদালত ও বিচারের প্রহসনকে ভয় না পায়। কারণ বিচার মানেই প্রায় সারা জীবনের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্য্যাতনমূলক নির্বাসন। তিনি তাদের সপক্ষে এই বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে প্রচারে নামবেন।

পীতর এবং তাঁর আরো পাঁচজন সঙ্গী যারা সরমোভোর ঐ মিছিল থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন, বিচারে তাঁদের পূর্বসাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাদের পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। সাইবেরিয়া থেকে পালাতে যেয়ে তাঁরা ধরা পড়েন। প্রথমবার পালানোর চেষ্টার অপরাধে তাঁদের শাস্তি হয় পঁচিশ ঘা বেত এবং দু'বছরের কঠোর শ্রম। আর দ্বিতীয় বার পালানোর চেষ্টার জন্য শাস্তি হয় পঞ্চাশ ঘা বেত এবং বারো বছরের সশ্রম দণ্ড।

ম্যাক্সিম্ গর্কী পীতরের নির্বাসন কালে প্রতিমাসে পনেরো রুবল করে পাঠাতেন এবং সাইবেরিয়া থেকে তাঁদের পালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন একসঙ্গে তিনশ রুবল।

১৯১৫ সালে নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসে গর্কীর সঙ্গে পীতর প্রথম দেখা করেন। এই সাক্ষাত হয় গর্কীর গ্রামের বাড়ীতে। পুলিসের নজর এড়ানোর জন্য পীতর গর্কীর গ্রামের এক চৈনিক নামে থাকেন। বাকী পর্বটুকু তিনি চীঠে

যান। পথ খুব সোজা ছিল না। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যদিয়ে দুর্গম বনজঙ্গল পেরিয়ে তাঁকে গর্কীর বাড়ীতে যেতে হয়। সাইবেরিয়া থেকে পালানোর পর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গর্কীর সঙ্গে দেখা করার জন্ম তার যে আকুলতা, তা তার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত হয়।

পীতর গর্কীর ছবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই সাক্ষাতের সময় গর্কীকে চিনতে পীতরের কোনো অসুবিধা হয় নি। প্রথম সাক্ষাতের এই ক্ষণটি পীতর তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভোলেননি। সাক্ষাতের এই ক্ষণটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'আমরা প্রবীণ শ্রমিকরা যারা কলেকারখানায় মার্কসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত দেখেছি। আমরা ছিলাম বিপ্লবী, রোমান্টিসষ্ট্। গর্কীর 'বাজপাখীর গান' আমাদের কাছে সংগ্রামের রণভেরীর মতো মনে হত এবং ঐ গান আমাদের সবসময় উদ্দীপ্ত করে তুলত। এখন সেই 'বাজপাখির গান' এর রচয়িতা আমার সামনে দাঁড়িয়ে—জীবন্ত—দুঃসাহসী বাজপাখী। রুশ বিপ্লবের ঝড়ের পাখী—ম্যাক্সিম্ গর্কী। তিনি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে চুম্বন করলেন। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তাহলে তোমার চেহারা এই।'

গর্কী আগেই খবর পেয়েছিলেন—'সাংঘাতিক ব্যক্তি' পীতর তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তাই তিনি পীতরের জন্ম ঘর এবং অন্যান্ত ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। ঝড় জলে ভিজে পীতর ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের পরিশ্রমে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। গর্কী তাঁর নিজের জামা কাপড় জুতো তাকে পরিয়ে দিলেন। কিন্তু জামা কাপড় জুতোর চেয়েও যা পীতরকে উষ্ণ করল, তাহল তাঁর গভীর আন্তরিক ব্যবহার আর নিবিড় কমল দৃষ্টির রুক্ষ স্নেহ।

তারপর তিনি পীতরকে, তার জীবন, বাবা-মা, বিপ্লবী কাজ এবং সরমোভোর শ্রমিক আন্দোলন এবং সংগঠন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। পীতরের কাহিনী থেকে গর্কী কিছু নোট নিলেন। কিন্তু পুলিস তাঁর বাড়ী খানা তল্লাসী করবার সময় এই নোটগুলি নিয়ে যায়। তাই 'মা' উপন্যাস তাঁকে অনেক স্মৃতি থেকেই লিখতে হয়। নিজের জন্মস্থান নিঝনি নভগরোদ (গর্কী) শহরের জাহাজ তৈরী কারখানা ক্রাসনোভে সরমোভোর পীতর জালমোভ রূপান্তরিত হলেন পাভেল ভ্লাসবএ। 'মা' উপন্যাসের সমগ্র পটভূমি এবং চরিত্রগুলি তাই এত জীবন্ত—এত বাস্তব।

রুশদেশের এই মহান সন্তান—গর্কীর পাভেল, পীতর জালোমভ রুশ জনগণের খুব কাছের, খুবই চেনা মানুষ। ১৯৫৬ এ আটাত্তর বৎসর বয়সে এই প্রবীণ সংগঠকের, রুশ বিপ্লবের এই প্রবীণ সংগ্রামীর মৃত্যু হয়।



মা

ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কী

(কিশোর সংস্করণ)



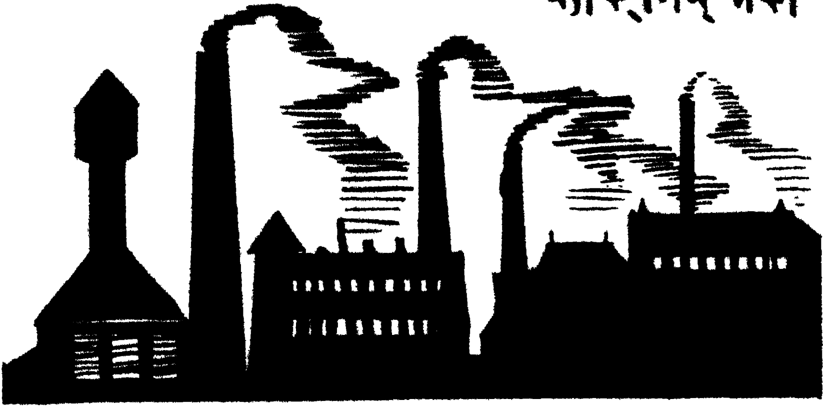
সম্পাদনা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দীপায়ন :: ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৯

মা

ম্যাক্‌সিম্ গর্কী



রোজ সকালবেলা ভোর না হতেই কারখানার বাঁশী বেজে ওঠে। বাঁশী তো নয় যেন দানবের চীৎকার। সেই দানবের চীৎকারে অন্ধকার ঘরে কুলিমজুরেরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। ঘুম-জড়ানো চোখেই দলে দলে তারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ঠিক সময়-মত কারখানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে যে।

রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় না। ভোরের দিকে ঘুম জমে উঠতে না উঠতেই ভেঙ্গে যায়। সমস্ত শরীর ব্যথায় কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে থাকে। ছেঁড়া ময়লা পোষাক, গা দিয়ে কারখানার চাকার তেলের দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। মুখে কথা নেই, হাসি নেই, কাঠের পুতুলের মতন তারা কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে কারখানার দিকে এগিয়ে চলে। সারা রাস্তা ধরে শুধু কাদায় পথ চলার শব্দ ওঠে। সে শব্দ শুনে মনে হয় যেন রাস্তাও তাদের দুঃখে সমবেদনা জানাচ্ছে। মাথা নীচু করে সারি বেঁধে তারা কারখানার ভেতরে গিয়ে ঢোকে। তখনও রাস্তায় ভাল করে সূর্যের আলো ফোটে না। শেষ হয় না রাত্রির অন্ধকার।

তারপর, সূর্য যখন অস্ত যায়, দিনের আলো যায় নিভে, তারা আবার দলে দলে তেমনি মাথা নীচু করে কারখানার ভেতর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন কারখানার আগুনে কয়লার মতন জ্বলে পুড়ে, সন্ধ্যার সময় ছাই-এর মতন তারা রাস্তায় এসে পড়ে। কারখানার

তেলে আর ময়লায় মুখ-চোখ, হাত-পা কালো হয়ে যায়। তবে যাবার সময় তাদের যেমন নীরব আর নিস্তব্ধ দেখায়, কারখানা থেকে ফিরবার সময় তাদের মুখে ফুটে ওঠে কথা, চলার ভঙ্গীটাও যেন একটু সতেজ মনে হয়। তার একমাত্র কারণ, সারাদিন কারখানার খাঁচায় আটক থাকার পর তারা যখন ছুটি পায়, তাদের মনে জেগে ওঠে আনন্দ, কেননা এখন তারা ভাঁটিখানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ভোড্‌কা খেতে পারবে। সারাদিনের এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জীবনে ভোড্‌কার নেশাই হলো তাদের একমাত্র আনন্দ। জীবনের সমস্ত হাহাকার আর যন্ত্রণা তারা ভোড্‌কার নেশায় কিছুক্ষণের মত ভুলে থাকে। তাই কারখানা থেকে ছুটি পেলেই তারা তাড়িখানার দিকে ছোটে। আকণ্ঠ ভরে সেই সস্তা মদ খায়। সারাদিনের যা রোজগার তা তাড়িখানাতেই শেষ হয়ে যায়। তারপর গভীর রাত্রিতে খালি পকেটে মাতাল হয়ে টলতে টলতে যে-যার অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢোকে। সেই অবস্থাতেই বেহুস হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার ভোর না হতেই যেই কারখানার বাঁশী বেজে ওঠে, অভ্যাস মত আবার তারা উঠে বসে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলতে থাকে, ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে থাকে, সেই অবস্থাতেই আবার তারা সারাদিনের মতন কারখানার খাঁচায় গিয়ে ঢোকে। অন্ধকার ঘর থেকে বন্ধ খাঁচা, এইভাবে তাদের নিরানন্দ জীবন বয়ে চলে একঘেয়ে সুরে। এই ভাবে পঞ্চাশ বছর ধরে নিরানন্দ জীবনের বোঝা বয়ে তারা পৃথিবী থেকে সরে পড়ে।

মাইকেল ভ্লাসভও ঠিক এইরকম ভাবে জীবনযাপন করতো। কোনদিন কেউ তার মুখে হাসির চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পায় নি। কালো একরাশ ভ্রূর মাঝখানে ছোট ছোট দুটো চোখ, সব সময়ই এমনভাবে কটমট করে চেয়ে থাকে যে দেখলেই মনে হয় যেন জগৎ-শুদ্ধ লোককে সে সন্দেহ করছে, জগৎ শুদ্ধ লোকের ওপর সে চটে আছে।

তবে তার একটা মস্ত বড় গুণ ছিল। কারখানার মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে সেরা মিস্ত্রী। সেই জন্যে সে কাউকেই তোয়াক্কা করতো না। দরকার হলে ম্যানেজারকেও সে দুকথা শুনিয়ে দিতো। ম্যানেজার

সামনাসামনি তাকে কিছু বলতে পারতো না, কিন্তু সুযোগ পেলেই জরিমানা করে তাকে জব্দ করবার চেষ্টা করতো।

ছুটির দিন সে সারাক্ষণ ভাঁটিখানায় পড়ে থাকতো। সেখানে মাতাল হয়ে একজনের না একজনের সঙ্গে ঝগড়া সে বাধাতোই। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, মদ খেলে আরো ভয়ংকর দেখাতো তাকে। যার ওপর রাগ পড়তো, তাকেই সে উত্তম-মধ্যম প্রহার করতো। সেইজন্যে সবাই মনে মনে তাকে ঘৃণা করতো। বহুবার তারা অনেকে মিলে তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে মারবে বলে ভেবেছে কিন্তু ভয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ আর তার কাছে এগোতে চাইতো না।

জগৎ-শুদ্ধ লোককে সে জানতো পাজী বদমায়েস বলে। পাজী বদমায়েস তার মুখে লেগেই থাকতো! কারখানার ম্যানেজারকে সে ঐ ভাষায় সম্বোধন করতো, উপরওয়ালাদেরও ঐ ভাষায় গালাগাল দিতো। রাস্তায় পুলিসের লোক দেখলেই বলে উঠতো,—'পাজী, বদমায়েস।' বাড়ীতে ফিরে স্ত্রীকেও ঐ ভাষায় ডাকতো। অবশ্য মাতাল না হয়ে সে কোনদিনই বাড়ী ফিরতো না।

তখন তার ছেলে পাভেলের বয়স হবে বছর চোদ্দ, একদিন মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরে ছেলের চুলের মুঠি ধরে দিলো টান। রাগে পাভেলের সারা দেহ ফুলে উঠলো। সামনে একটা লোহার হাতুড়ি পড়ে ছিল। ছুটে গিয়ে সেই হাতুড়িটা তুলে নিয়ে বাপকে রুখে দাঁড়ালো সে। চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললো,—'খবরদার, আমার গায়ে আর হাত দেবে না। অকারণে তোমার অনেক মার সহ্য করেছি আমি। আর সহ্য করবো না।'

হাতুড়ি হাতে ছেলের দিকে একদৃষ্টিতে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হো হো করে হেসে উঠলো ভ্লাসভ,—'সাবাস! ঠিক আছে।'

পরের দিন সকালে স্ত্রীকে ডেকে বললে,—'এই পাজী বদমায়েস, শোন্—আজ থেকে আর আমার কাছে টাকা পয়সা চাইবি না। তোর ছেলেই এখন লায়েক হয়েছে, এবার থেকে তোর ছেলেই তোকে খাওয়াবে, বুঝলি?'



ভয়ে ভয়ে পাভেলের মা বলে,—'আর তুমি যা কিছু রোজগার করবে, সবটাই তাড়ি খেয়ে উড়িয়ে দেবে বুঝি?'

মাইকেল গর্জে ওঠে,—'তাতে তোর কি, পাজী বদমায়েস?'

সেইদিন থেকে যতদিন পর্যন্ত সে বেঁচে ছিল, ছেলের সঙ্গে আর একদিনও একটাও কথা বলে নি। কোন খোঁজ খবর পর্যন্ত নিতো না। তবে এই নিঃসঙ্গ জীবনে একজন ছিল তার নিত্যসঙ্গী, যে তাকে ভয় করতো না। সে হলো তার কুকুর। রোজ সকালে যখন সে কারখানায় যেতো, কুকুরটাও তার পিছু পিছু কারখানার দরজা পর্যন্ত যেতো। সন্ধ্যার সময় যখন সে কারখানার ফটক থেকে বেরুতো, দেখতো তার অপেক্ষায় কুকুরটি ঠিক ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটিখানায় চলতো। ছুটির দিন সে যেখানে যেখানে যেতো, কুকুরটিও তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেতো। রাত্তিরে বাড়ী ফিরে এসে তার নিজের প্লেট থেকে কুকুরটাকে খাওয়াতো। ঘুমুবার সময় তার পায়ের কাছেই কুকুরটী ঘুমিয়ে পড়তো।

এইভাবে আরো তিন বছর সে বেঁচে ছিল। একদিন কারখানা থেকে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো! পাঁচদিন সেই বিছানায় শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করলো সে। পেটের ভেতর এত যন্ত্রণা হতো যে চীৎকার করে বলতো,—'আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্, বিষ খাইয়ে!'

তার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তার ডেকে আনলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লো,—'এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে!'

মাইকেল, সেই কথা শুনে চীৎকার করে উঠলো,—'বেরোও পাজী বদমায়েস! আমি কোথাও যেতে চাই না! যদি মরতেই হয়, এখানেই মরবো আমি।'

সেইদিন রাত্রিশেষে ভোর বেলায় সে মারা গেল। ঠিক তখন কারখানার বাঁশী বাজছে। দলে দলে মজুররা আব-অন্ধকারে পথে এগিয়ে চলেছে।

কেউ তাকে দেখতে পারতো না। তাই তার কবরের পাশে ছিলো

কাউকেই পাওয়া গেল না। একটা বুড়ো মাতাল, একটা দাগী চোর আর পথের গোটাকতক ভিখিরীর সামনে তাকে কবর দেওয়া হলো। মাটী দেওয়া হয়ে গেলে তার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ছেলের হাত ধরে ফিরে এলো।

কবরের কাছে বসে রইলো শুধু একটি প্রাণী। তার নিত্য সঙ্গী কুকুরটী। কবরের সদ্য-খোঁড়া মাটিতে মুখ গুঁজে চীৎকার করে সে তার মনিবকে ডাকতে থাকে।

বাপ মারা যাবার ঠিক দু সপ্তাহ পরে পাভেল একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এলো, ঠিক তার বাপের মতনই মাতাল হয়ে, টলতে টলতে।



ঠিক তার বাপের মতনই কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে খাবারের জায়গায় গিয়ে বসলো, তার বাপের মতনই গালাগাল দিয়ে মাকে হুকুম করলো,—'এই, যা খাবার নিয়ে আয় শিগ্‌গির!'

জীবনে সে এই প্রথম মদ খেয়েছে। নেশায় তখন তার জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছে।

ছেলের দিকে চেয়ে নীরবে মার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। ধীরে কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে আদর করতে করতে বলে ওঠেন,—'দুষ্টু-ছেলে!'

মা যত আদর করে, সে তত অস্বস্তি বোধ করে। নেশার ভেতর থেকে মার মুখের দিকে চেয়ে দেখে মা কাঁদছে! মার সেই কান্না যেন কাঁটার মতন তার ভেতরে কোথায় বিঁধতে থাকে। শরীর ক্রমশই তার অবসন্ন হয়ে আসে।

বুকে টেনে নিয়ে মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। হাত বুলোতে বুলোতে মা শুধু বলেন,—'ওরে, কেন তুই এ কাজ করলি বাবা?'

পাভেল যে কি উত্তর দেবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তার সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে উঠতে থাকে। সেইখানেই মার গায়ে সে বমি করে ফেলে। অবসন্ন হয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়ে। ছেলের মাথায় মা আস্তে আস্তে বালিশ দিয়ে দেন, মুখ-চোখ ধুইয়ে দেন। আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে পাভেল শুনতে পায়, মা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—'তুই যা আমাকে খাওয়াবি, তা বুঝতে পারছি।'

ঘুমের মধ্যেই পাভেল জবাব দেয়—'কেন মা, সবাই তো মদ খায়!'

চোখ মুছতে মুছতে মা বলে,—'সবাই খায় বলে, তুইও খাবি? ওরে, তোর বাবা যে তোদের দুজনের হয়ে খেয়ে গিয়েছে। কত যে যন্ত্রনা তার হাতে সয়েছি······তুই আবার তার ওপর আমাকে যন্ত্রণা দিবি?'

পাভেলের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। মার কথায় সেই অচৈতন্য অবস্থার ভেতর থেকে সে ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করে। বলে,—'আঃ, মা, আর কেঁদো না! একটু ঠাণ্ডা জল দাও দেখি।'

মা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জল আনতে ওঠেন। জল নিয়ে এসে দেখেন, পাভেল ঘুমিয়ে পড়েছে। নিদ্রিত পুত্রের শিয়রে বসে মা ভগবানকে ডাকেন,—'ওগো ভগবান! দয়া করো! দয়া করো! আমার পাভেলকে তুমি ভাল করে দাও।'



এমনিভাবে সব কুলী-মজুরদের ছেলে যেমন কারখানায় কাজ করে, ছুটির পরে মদ খায়, রাস্তায় মারামারি করে, আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, পাভেলও কয়েক মাস ঠিক তেমনি ভাবে কাটিয়ে দিলো। ছুটির দিন গভীর রাত্রিতে অচৈতন্য মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরতো। বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতো। আর বলতো,—ভাল লাগেনা, কিছুই ভাল লাগে না।

জল-ভরা চোখ নিয়ে মা শুধু নীরবে ছেলের মাথার কাছে বসে থাকেন, শুধু নীরবে ভগবানের কাছে অন্তরের প্রার্থনা জানান।

কয়েক মাস পরে মা লক্ষ্য করেন, তাঁর ছেলের কেমন যেন পরিবর্তন ঘটছে। পরিবর্তন যে কিসের বা কেন, তা মা কিছুই বুঝতে পারেন না। সেদিন ছিল কারখানার ছুটি, পাভেল অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরলো কিন্তু কি আশ্চর্য, সম্পূর্ণ সুস্থ।

ছুটির দিন কুলী-মজুরেরা তাড়িখানায় গিয়ে প্রাণ ভরে ভোড্‌কা খায়, বুড়োদের দেখাদেখি ছেলে-ছোকরাও তাই করে। তারপর গভীর রাত্রিতে মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে। এই হলো এখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক স্বাভাবিক ঘটনা। পাভেলও প্রত্যেক ছুটির দিন এইরকম মাতাল হয়েই রাত্রিতে বাড়ী ফিরতো। তাই হঠাৎ সেদিন পাভেলকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বাড়ী ফিরতে দেখে, মা মনে করলেন, নিশ্চয়ই পাভেলের অসুখ করেছে। অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। পাভেল কোন কথা বলে না, কোন হৈ চৈ করে না। চুপটি করে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে।

এর পর থেকে মা লক্ষ্য করেন, তাঁর ছেলের চাল-চলনে কথাবার্তায় কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। আর পাঁচটা কুলী-মজুরের ছেলের মতন সে আর এখন রাস্তায় হৈ চৈ বা মারামারি করে না। খবর নিয়ে জানলেন, ইদানীং সে আর ভাঁটিখানাতেও যায় না। পুরানো সব বন্ধুরা তার খোঁজে বাড়িতে ডাকতে আসে, কিন্তু পাভেল তাদের ডাকে আর সাড়া দেয় না। তাদের সঙ্গে আর মেশে না।

মা বুঝতে পারেন, তাঁর ছেলের বেশ একটা পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু কি যে সে পরিবর্তন, তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারেন না। আগে বাড়ী ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে যে রকম চড়াগলায় পাভেল কথা বলতো, আজকাল আর সেরকম চড়াগলায় তাঁর সঙ্গে কোন কথাই বলে না। দু একটা কথা যা বলে, তাও খুব আস্তে নরম করে হেসে বলে। মা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, তাঁর ছেলের কথাবার্তার ভাষাও যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। চিরকাল কুলী-মজুরদের মুখে, পাভেলের বাবার মুখে, পাভেলের মুখেও যে ধরনের ভাষা তিনি শুনে এসেছেন, আজকাল পাভেলের মুখ দিয়ে সেরকম ভাষা আর তিনি শুনতে পান না। তার বদলে পাভেল এমন সব ভাষা ব্যবহার করে, যার

মানে মা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। এরকম ভাষা মা তো কখনো শোনেন নি আর।

ছুটির দিনে সে অবশ্য আগের মতনই বাইরে চলে যায়, কিন্তু কোথায় যায় তার কোন সন্ধানই মা পান না। তার পুরোনো সঙ্গীরাও কেউ বলতে পারে না, কেন না তাদের সঙ্গে সে আর কোথাও যায় না। রাত্রিতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েই সে বাড়ী ফিরে আসে।

একদিন মা দেখলেন, পাভেল সঙ্গে করে কতকগুলো বই নিয়ে এলো। ঘরের ভেতর বইগুলো সযত্নে লুকিয়ে রেখে দিলো। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মা দেখেন, শিয়রে আলো জেলে পাভেল নীরবে বই পড়ছে।

নিজের ছেলের মুখের দিকে মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন, দেখেন পাভেলের মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে পাভেলের যে-মুখ তিনি দেখে আসছেন, আজ যেন সে-মুখ তিনি চিনে উঠতে পারছেন না। পাভেল আগে যা কিছুই করুক না কেন, তাকে চিনতে বা বুঝতে মার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হতো না। কিন্তু আজ নিজের ছেলের দিকে চেয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। যেন তাকে আর তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। গাঁয়ের মন্দ ছেলেদের সংসর্গ পাভেল ত্যাগ করেছে, একথা বুঝতে পারেন এবং বুঝতে পেরে তাঁর মনে খুব আনন্দই হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কি যেন একটা অজানা ভয় মায়ের বুক জুড়ে বসে; কোথায় সে যায়, কি সে করে, কি সে ভাবে—তার কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অজানা কিসের যেন এক বিপুল ভয় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে উতলা করে তোলে।

ছেলের সেই গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে মা-র মন উতলা হয়ে ওঠে। কাছে এসে আদর করে জিজ্ঞাসা করেন,—'হ্যাঁরে, পাভলুসা, কি হয়েছে তোর?'

পাভেল শুষ্ককণ্ঠে শুধু বলে,—'কই মা, কিছু তো হয় নি আমার।'

মার মন এই ছোট্ট উত্তরে সন্তুষ্ট হতে চায় না। আবার জিজ্ঞাসা করেন তিনি,—'হ্যাঁরে, তোর কোন অসুখ-টসুখ করছে নাকি?'

পাভেল তেমনি ছোট্ট করে উত্তর দেয়,—'কই, নাতো!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন,—'সারাদিন কেমন মুখ ভার করে থাকিস···রোজ রোজ রোগা হয়ে যাচ্ছিস্‌···হ্যাঁরে, আমায় বল্‌, কি হয়েছে তোর?'

পাভেল শুধু বলে,—'কিছুই হয় নি ত, মা!'

এর বেশী আর কোন কথাবার্তা হয় না। ক্রমশ পাভেল যেন আরো চুপচাপ হয়ে যায়। সদাসর্বদা কি যেন ভাবে সে! চোখে মুখে কিসের যেন একটা ছাপ ফুটে ওঠে, মা কিছুই বুঝতে পারেন না। আগে ছুটির দিনে পোষাক আর পরিচ্ছদের কত রকমের বাবুয়ানি সে করতো, কিন্তু ইদানীং সে-সব পোষাক আর ব্যবহারই করে না। তবে একটা জিনিস মা লক্ষ্য করেন, পাভেল ইদানিং সব সময়ই খুবই সাদাসিধে পোশাক ব্যবহার করে, কিন্তু আগের মতন তা আর ময়লা বা অপরিষ্কার থাকে না। নিজের হাতে কেচেকুচে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে। যেটুকু কথা বলে, তার মধ্যে এমন একটা নরম কোমল সুর বেজে ওঠে, মার কানে তা নিদারুণ অস্বাভাবিক লাগে। যেদিন থেকে তাঁর জ্ঞান হয়েছে, সেদিন থেকে তিনি পুরুষের গলায় শুধু কর্কশ সুরই শুনে এসেছেন,—ধমকানি, চেঁচানি আর গালাগাল। পাভেলের কণ্ঠের এই নরম কোমলতা তাঁর কানে বিচিত্র অস্বাভাবিক লাগে।

একদিন মা দেখেন, পাভেল কি একটা ছবি নিয়ে এসে দেয়ালে টাঙালো। মা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখেন, কিন্তু ছবিটির কোন অর্থই তিনি খুঁজে পান না। ছবি বা বই, কিছুরই সঙ্গে তাঁর জীবনে হয় নি কোন পরিচয়!

মাকে সেই ভাবে অবাক হয়ে ছবির দিক চেয়ে থাকতে দেখে পাভেল বলে,—'মা, এটা নব-জীবনের ছবি,···মৃত্যুর ওপার থেকে যিশু নব-জীবনে জেগে উঠছেন।'

নব-জীবন···মৃত্যুর ওপার···মা কিছুই বুঝতে পারেন না, শুধু বুঝতে পারেন একটী কথা, যিশু। বুঝতে পারেন, তাঁর ছেলে তাহলে যিশুর ভক্ত হয়েছে, যিশুকে ভালবাসে। আনন্দে তাঁর মন উদ্বেল হয়ে ওঠে কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায়, পাভেলতো কোনদিন গির্জায় যায় না।



মনের মধ্যে এক দুরন্ত প্রশ্ন জেগে ওঠে, যে যিশুকে এত ভালবাসে সে কেন গির্জায় যায় না ?

এ প্রশ্নের কোনই উত্তর মা খুঁজে বার করতে পারেন না।

ক্রমে ক্রমে একটি, দুটি, তিনটি করে দেয়ালে আরো সব ছবি পাভেল টাঙায়। কাদের ছবি, মা বুঝে উঠতে পারেন না। একখানি, দুখানি করে বহু বইও ঘরে জমা হয়ে ওঠে। একটা থাকে পাভেল সব সাজিয়ে রাখে। বইএর স্তূপ। এত বই নিয়ে পাভেল কি করে। কি আছে এই সব বই-এ ?

মা কিছুই বুঝতে পারেন না। ছেলেও কিছু বলেন না। প্রতিদিন যেন সে আরো গম্ভীর, আরো নীরব হয়ে যায়। মার মনে হয়, যেন তাঁর ছেলে অন্য কোথাও, অনেক দূরে তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, মা আর তার নাগাল পাচ্ছেন না। নীরবে ভগবানের কাছে চোখের জলে প্রার্থনা করেন,—হে ভগবান! প্রত্যেকের ছেলে কেমন হাসে, খেলে, ঘুরে বেড়ায়, হৈ হৈ করে···আর তাঁর ছেলের এ কেমন ব্যাপার ? সন্ন্যাসী হবে না কি ?

এইভাবে দু-দুটো বছর কেটে যায়। দুটো বছর ধরে মার বুকে শুধু বেড়ে ওঠে অজানা আতঙ্ক আর প্রশ্ন। দুবছরে পাভেল যেন আরো বহুদূরে সরে যায় মার কাছ থেকে।

একদিন সন্ধ্যার পর পাভেল ঘরে বসে বই পড়ছে। মার ভারি একা লাগে। তিনি আর এমনিধারা চুপটী করে থাকতে পারেন না। ছেলের কাছে এসে বসেন। পাভেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন,—'শোন্ খোকা, তুই সারাদিন কি করিস্, আমাকে তুই বুঝিয়ে বল! রোজ রোজ রাত্তিরে এত মন দিয়ে তুই এসব কি পড়িস্ ?'

মার দিকে চেয়ে পাভেল হেসে বলে,—'বসো মা, সব বলছি!'

মার বুক গুর্ গুর্ করে কাঁপতে থাকে। মনে হয়, কি যেন একটা ভয়ঙ্কর কথা এখুনি শুনবেন।

পাভেল ধীরে ধীরে বলে,—'আমি যেসব বই পড়ি, এসব বই হলো নিষিদ্ধ। পড়া বারণ। কেন নিষিদ্ধ জানো ? তোমার আমার, আমাদের চারিদিকে এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী

আর মজুর রয়েছে, যারা চব্বিশ ঘন্টা খেটেও পেট ভরে খেতে পায় না, মানুষ হয়েও যারা মানুষের মতন বেঁচে থাকতে পায় না, কি করলে তারা বাঁচার মতন বেঁচে থাকতে পারবে, তারই সব সত্য, উপায় এই সব বইতে লেখা আছে। এই সব বই লুকিয়ে গোপনে ছাপা হয়, লুকিয়ে বিলানো হয়। যদি কারুর কাছে এই সব বই পুলিশের লোক দেখতে পায়, তাহলে তক্ষুণি তাকে ধরে জেলে নিয়ে আটকে রাখবে···'

ভয়ে মার সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। আতংকের কণ্ঠে বলেন,—'তাহলে কেন তুই এসব বই পড়িস্ আর বাড়ীতে রাখিস্ ?'

পাভেল হেসে বলে,—'মা, আমি যে সত্যকে জানতে চাই।'

ছেলের এই উত্তর মা ঠিক বুঝতে পারেন না। শুধু বুঝতে পারেন, তাঁর ছেলে এমন একটা কাজ করছে, যার ফলে তাকে জেলে যেতে হবে···তাকে···উঃ! মা আর ভাবতে পারেন না, তাঁর মনে হয় এখনই বুঝি পুলিশের লোকেরা এসে তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে। কান্না ছাড়া তাঁর আর কি উপায় আছে ?

মার কাছে এগিয়ে গিয়ে পাভেল মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,— 'কান্না বন্ধ করে তুমি আমার কথা শোন মা। একবার তুমি তোমার নিজের জীবনের কথাই ভেবে দেখো। আজ তোমার চল্লিশ বছরেরও বেশী বয়স হলো, তুমি বলো, জীবনে কোনদিন কি তুমি সুখ পেয়েছ, পেয়েছ শান্তি ? কোনদিন কি ভেবে দেখেছ, জীবন কাকে বলে ? সারা জীবন ধরে তুমি শুধু অত্যাচার আর নির্যাতন আর উপবাসই সহ্য করে এসেছ! ছেলেবেলা থেকে আমি দেখেছি, বাবা মাতাল হয়ে বাড়ীতে এসে তোমাকে মারতেন, তুমি শুধু কাঁদতে আর মুখ বুঁজে সব সহ্য করতে। তখন বাবার ওপর আমার খুব রাগ হতো। কিন্তু আমার আজ আর বাবার ওপর রাগ হয় না। আজ যে আমি বুঝতে পেরেছি, কেন তিনি তোমার ওপর ঐ রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। সারাদিন একটা পশুর মতন কারখানায় তিনি যে কষ্ট, যে নির্যাতন, যে অপমান ভোগ করতেন, মাতাল হয়ে বাড়ীতে এসে তার জ্বালা তিনি তোমার

ওপর নির্যাতন করে দূর করতেন। কি করে ভাল করে বেঁচে থাকতে হয়, তা ত কেউ তাঁকে শেখায়নি, তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই। তিরিশ বছর ধরে ভূতের মতন শুধু কারখানায় খেটে মরেছেন। ছেলেবেলায় তিনি যখন কারখানায় ঢুকেছিলেন, তখন কারখানায় ছিলো দুটো মাত্র ছোট ঘর, আর আজ সেখানে উঠেছে সাত সাতখানা বড় বাড়ী। আর কুলী-মজুরদের অবস্থা হয়েছে আরো খারাপ। এমনি ধারাই হয়, কল বাড়ে, কারখানা বাড়ে, আর তার চাকায় তেল জোগাতে জোগাতে মানুষ মরে।'

ছেলের কথা শুনতে শুনতে মার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এতখানি তাঁর বয়স হলো, কৈ কেউ তো কোনদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নি, তিনি কেমন আছেন? এমন করে তাঁর দুঃখে আর তো কেউ দুঃখ জানায় নি? চিরকাল শুধু মুখ বুঁজে দুঃখ কষ্টই সহ্য করে এসেছেন, দুঃখকষ্ট মুখ বুজে সহ্য করবার জন্যেই মেয়েদের জীবন, এই কথাই তিনি শুনে এসেছেন আর নিজেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজ হঠাৎ ছেলের কথা থেকে যখন জানতে পারলেন, তাঁর এবং আর সকলের দুঃখ কষ্টের কথা তাঁর ছেলে এমন করে ভাবছে, পুত্র-গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠলো! কিন্তু পাভেলের সব কথা তিনি ভাল করে বুঝতে পারলেন না। তাই জিজ্ঞাসা করলেন,—'কিন্তু তার জন্যে তুই কি করবি?'

পাভেল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—'আমি সব জানতে চাই মা, আর সবাইকে জানাতেও চাই। জানতে চাই কেন আমাদের এত দুঃখকষ্ট, কি করে সে সব দুঃখ কষ্ট দূর হবে—সেই সঙ্গে হাজার হাজার যে সব লোক রয়েছে, নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে যারা কিছুই জানে না, তাদেরও সচেতন করতে চাই তাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে···'

আবেগের বশে পাভেল বলে চলে, 'রাশিয়ার মুক্তির জন্যে দলে দলে যে সব লোক প্রাণ দিয়েছে, কারাগারে নির্যাতন সহ্য করেছে, তাদের কথা।'

মার কাছে সব কথাই নতুন লাগে। পরের জন্যে এমন করে মানুষ নিজের প্রাণ দিতে পারে, সেকথা তিনি কোনদিনই শোনেন নি। তিনি কোনদিনই শোনেন নি, রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘকাল

ধরে যে আন্দোলন চলেছে, তার কথা। আর দশজনের মত নিজের ছোট্ট সংসারের বাইরে জগতের আর কোন কিছুরই খবর তিনি জানেন না। তাই ছেলের মুখে এই সব কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'হ্যাঁরে, এ সব সত্যি না কি?'

পাভেলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে,—'হ্যাঁ মা, আমি যা বলছি তার প্রত্যেকটা অক্ষর সত্য। তুমি শুধু তোমার আশেপাশে খারাপ লোকদেরই দেখেছ, কিন্তু জগতে এমন লোকও আছে যারা হাসতে হাসতে পরের জন্যে প্রাণ দেয়। আমি স্বচক্ষে তাদের দেখেছি, তারাই হলো এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, অমর মানুষ!

পাভেলের কথায় আজ মার চোখের সামনে একটা সম্পূর্ণ নতুন জগতের দরজা খুলে যায় কিন্তু ভয়ে তাঁর বুক কাঁপতে থাকে। এ নতুন জগতের কথা কিছুই জানেন না তিনি। সে-জগতে ছেলেকে ছেড়ে দিতে তার মন ভেঙ্গে পড়ে।

ছেলের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বলেন, —'আমি অত সব কিছুই জানি নে বাবা, মুখ্যু মেয়েমানুষ। তবে মায়ের অনুরোধ, যেখানে সেখানে বেফাঁস কোন কথা বলিস্ না বাবা! চারপাশের লোকজন মোটেই ভাল নয় রে!'

সেদিন থেকে প্রতি রাত্রে পাভেল ঘুমিয়ে পড়লে পাভেলের শিয়রে দাঁড়িয়ে নীরবে মা প্রার্থনা করেন। ভগবানকে জানান,— আমার বাছাকে তুমি দেখো ভগবান!

একদিন বাইরে বেরুবার সময় পাভেল মাকে ডেকে বললো,—'মা, এই শনিবার সন্ধ্যার পর এখানে জনকতক লোক আসবে···'

মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'কারা? কোথা থেকে আসবে?'

পাভেল জানায়,—'দুএকজন এই গাঁয়েরই লোক, বাকী সবাই আসবে শহর থেকে।'

—'শহর থেকে?' বলেই মা কেঁদে ফেলেন। মার ধারণা, শহরে শুধু ভয়ঙ্কর লোকেরাই থাকে।

—'এ কি মা। তুমি কাঁদছো কেন?' পাভেল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—'কান্না আসছে, তাই কাঁদছি। শহরের লোক···আমার বড় ভয় করছে বাবা।' কাঁদতে কাঁদতে মা বলেন।

গম্ভীর হয়ে পাভেল বলে,—'দেখ মা, এই ভয়ই হলো আমাদের সর্বনাশের মূল। ভয় পেয়ে কিন্তু এরকম কাঁদলে আর চলবে না···'

মাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে পাভেল বেরিয়ে যায়। মা বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকেন, কে তারা, না জানি কি ভয়ঙ্কর লোক তারা, তারাই তাঁর ছেলেকে না জানি কি ভয়ঙ্কর পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে···

মার বুকের ভেতর বাজতে থাকে শনিবার, শনিবার তারা আসবে।

শনিবার সন্ধ্যার সময় পাভেল মাকে ডেকে বললো,—'মা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, এখুনি ফিরবো। ইতিমধ্যে যদি তারা আসে, তাদের কিন্তু ঘরে বসতে বলবে, বুঝলে?'

পাভেল বেরিয়ে যায়। পাভেল বাড়ী থাকতে মার যেটুকু সাহস ছিল, পাভেল চলে যাওয়াতে তা-ও চলে গেল। একা ঘরে ভয়ে মার সর্বশরীর কাঁপতে থাকে। তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ পড়ে থাকে দরজার কাছে।

কিছুক্ষণ পরেই বাইরে কোথাও বাঁশী বেজে উঠলো। বাঁশীটা যেন দরজার কাছে এসে থেমে গেল। মা উঠে দাঁড়ালেন। দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। মা দেখেন, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে মস্তবড় টুপিওয়ালা একটা মাথা প্রথমে এগিয়ে এলো, তারপর সেই টুপিশুদ্ধ মাথা নিয়ে একটা রোগা ছেলে সটান ঘরে ঢুকে তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। মা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছেলেটী মার সামনে এসে হাসতে হাসতে বলে--'নমস্কার!'

মার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না।

ছেলেটী জিজ্ঞাসা করে,—'পাভেল এখনো ফেরে নি বুঝি?'

মার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, ছেলেটী গায়ের কোট খুলে ফেলে, কোটের ওপর থেকে বরফগুলো ঝেড়ে ফেলে দেয়। তারপর

এগিয়ে গিয়ে কোটটা ঘরের এককোণে টাঙিয়ে রাখে, যেন এটা তার নিজেরই ঘর।

শুকনো গলায় ভয়ে ভয়ে মা বলেন,—'পাভেল এখুনি ফিরবে। বসো তুমি!'

ছেলেটী সহজভাবে মার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে ওঠে,—'হ্যাঁ, বসবো তো নিশ্চয়ই!'

হঠাৎ মার মুখের দিকে চেয়ে ছেলেটা বলে উঠলো,—'তোমার মুখে ও কিসের দাগ মা?'

একজন অপরিচিত লোকের মুখ থেকে হঠাৎ সেই প্রশ্ন শুনে মা রেগে উঠলেন। কারণ, তাঁর মুখের এই দাগ হলো, প্রহারের দাগ, তাঁর স্বামীর হাতের নির্মম নির্যাতনের স্মৃতি। কিন্তু সেকথা একজন অপরিচিত লোককে তিনি বলতেইবা যাবেন কেন? লোকটাই বা কি রকম অভদ্র।

মা রেগে বললেন,—'সে কথায় তোমার কি দরকার বাছা?'

ছেলেটি কিন্তু খুব নরম গলায় বললো,—'রাগ কোরনা মা! তোমায় একথা জিগ্যেস করলুম কেন জান? যে মা আমাকে পালন করেছিল, তারও কপালে ছিল ঠিক এরকমই একটা দাগ। আমার সেই পালক মার স্বামীটি ছিল মুচী। রাগের মাথায় একদিন জুতো সেলাই-করা যন্ত্র আমার মার কপালে ছুঁড়ে মারে! তোমার কপালেও ঐ দাগ দেখে তাই আমার সেই দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়লো।'

মায়ের মনের রাগ কোথায় চলে গেল। উল্টে ছেলেটির ওপর কোথা থেকে এক তীব্র মায়া জেগে উঠলো। স্নেহভরা কণ্ঠে মা বল্লেন,—'না বাছা, রাগ আমি করি নি! তবে হঠাৎ তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলে, তাই মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তোমার হাসিখুশী সোজা কথায় আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গিয়েছে বাছা হাঁ বাছা, আমার কপালের এই দাগও আমার স্বামীরই দেওয়া। তবে তার জন্যে আমার মনে কোন দুঃখ নেই! এখন এই দাগটি তাঁর পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন!'

কথায় বার্তায় মার মনের ভয় কখন যে চলে গেল, তা মা টেরই পেলেন না। ছেলেটির প্রাণখোলা কথায় মার মন স্নেহে ভরে উঠলো।

কথায় কথায় মা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেলেটি বললো,—'লিটিল রাশিয়া আমার জন্মভূমি। তাই আমার বন্ধুরা আমায় লিটিল রাশিয়ান্ বলে ডাকে।'

মা মনে মনে প্রার্থনা করেন,—'হে ভগবান, আর যারা সব আসবে, তারাও যেন এই ছেলেটির মতই ভাল হয়।'



এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ হলো। দরজা ঠেলে এবার ঢুকলো, একটি মেয়ে। অতি সাদাসিধে পোষাক, মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল, অল্পবয়সী একটি মেয়ে।

ঘরে ঢুকে লিটিল-রাশিয়ানকে দেখেই মেয়েটি বলে ওঠে,—'আমার দেরী হয়ে গেল নাকি?'

লিটিল রাশিয়ান বলে,—'আরে না! তা তুমি হেঁটে এলে বুঝি?'

মেয়েটি হাত ঘষতে ঘষতে বলে,—'হ্যাঁ!' তারপর মার দিকে নজর পড়তেই মেয়েটি মার কাছে এগিয়ে গিয়ে কোমলকণ্ঠে বলে,—'আপনিই বুঝি পাভলের মা! নমস্কার মা। আমার নাম নিশ্চয়ই আপনি জানেন না? আমার নাম নাতাশা!'

একান্ত আপনার জনের মতন মেয়েটি মার কাছে এসে দাঁড়ায়। মার মনে হয়, যেন তাঁর নিজের মেয়েই বুঝি অনেকদিন পরে তাঁর কাছে আবার ফিরে এসেছে। মার মনে খুব আনন্দ হয়, চা তৈরী করবার জন্য মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন।

রান্নাঘর থেকে হঠাৎ মার নজরে পড়লো, তাঁদেরই পাড়ার নিকোলে দরজা ঠেলে ঢুকছে। নিকোলেকে দেখে মা চমকে উঠলেন, সবাই জানে, ওর বাবা হলো একজন ডাকসাইটে চোর। কি সর্বনাশ! সেই চোরের ছেলেও পাভেলদের দলে আছে? মা ভেবে ঠিক করতে পারেন না, এরা কি, আর কিইবা এদের মতলব!

ক্রমে ক্রমে দুএকজন করে সবাই এসে উপস্থিত হয়। পাভেলও ফিরে আসে। মা রান্নাঘর থেকে পাভেলের বন্ধুদের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চেয়ে দেখেন।

ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি মা জিজ্ঞাসা করেন,—'হ্যাঁরে, এদেরকেই কি ভয়ানক লোক বলে?'

পাভেল ঘাড় নেড়ে হেসে বলে,—'হ্যাঁ মা, এরাই হলো সেইসব ভয়ানক লোক!'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,—'মাগো, এরা যে সব দুধের বাচ্চা, আহারে!'

স্নেহে মার মন ভরে ওঠে। সবার জন্যে তিনি মহানন্দে চা তৈরী করতে শুরু করেন।

ওধারে তখন ঘরের ভেতর পাভেলদের বৈঠক বসে গিয়েছে। মা কান খাড়া করে তাদের সব কথা শোনেন।

তারা আলোচনা করে, মানুষের দুঃখের কথা, মানুষের বেদনার কথা। আলোচনা করে রাশিয়ার চারদিকে মানুষ দিনের পর দিন কি দুঃখ আর কি কষ্ট সহ্য করে চলেছে। বলতে বলতে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে—আবার কিছুক্ষণ পরে মা দেখেন, তারা সবাই গোল হয়ে বসেছে, আর তাদের মাঝখানে বসে নাতাশা একটা বই পড়ছে। সবাই এক মনে শুনছে। নাতাশা পড়ছে মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস। কি করে বন্য অবস্থা থেকে মানুষ সভ্য হলো, কিভাবে ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলেছে—

মা মন-প্রাণ দিয়ে কান খাড়া করে সব শোনেন। বুঝতে পারেন না এইসব কথার মধ্যে আপত্তিরই বা কি আছে? এর মধ্যে অন্যায়টাই বা কোথায়?

ভাবতে ভাবতে মা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। হঠাৎ চেঁচামেচিতে তাঁর হুঁস হলো।

এই তো ওরা চুপটি করে পড়া শুনছিল, হঠাৎ এর মধ্যে কি হলো? কেন ওরা ও-রকম রেগে কথা বলছে? মার মনে হলো, এখুনি বুঝি ওদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি হবে! কিন্তু কি আশ্চর্য, ওরা তো কেউ কাউকে গালাগাল দিচ্ছে না, কোন কুৎসিত ভাষাও বলছে না? তবে এ আবার কি রকম রাগারাগি? মা কিছুই বুঝতে পারেন না।

পাভেলরা নিজেদের মধ্যে জোর তর্ক করছে। সকলেই উত্তেজনায় চেঁচিয়ে কথা বলছে। মা অবাক হয়ে শোনেন। হঠাৎ দেখেন সকলেই থেমে গিয়েছে, শুধু তাঁর ছেলের গলার আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে। পাভেল দাঁড়িয়ে বলছে,—'যারা আজ আমাদের ঘাড়ে চেপে আমাদের চোখ বেঁধে রাখতে চাইছে, তাদের আমরা স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, আমরা অন্ধ নই, বনের পশুও নই। কোন রকমে ছুমুঠো অন্ন

যোগাড় করবার জন্মেই শুধু আমাদের জীবন নয়। আমাদেরও অধিকার আছে, মানুষের মত এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচবার, আমাদেরও অধিকার আছে আনন্দের, স্বাস্থ্যের, শিক্ষার······

আর একজন বলে উঠলো,—'আমাদের এই সব কোনো দাবীই ত ওরা স্বীকার করে না।'

আবার তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো। দেখতে দেখতে রাত বারোটা বেজে গেল। একে একে তখন পাভেলের বন্ধুরা বিদায় নিয়ে চলে যেতে থাকে। নাতাশাকে বিদায় দিতে গিয়ে, মার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো। এই নিদারুণ শীতের রাত্রি···বাইরে বরফ পড়ছে···মা চেয়ে দেখলেন, মেয়েটীর গায়ে সামান্য সূতির পোষাক··· পায়ের মোজাটাও সূতির। এই ঠাণ্ডায় মেয়েটার যে বড্ড কষ্ট হবে।

নাতাশাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মা বলেন,—'এই ঠাণ্ডায় ঐ পাতলা মোজায় কি চলে? বাছারে আমার! আমি একটা পশমের মোজা বুনে দেবো, কেমন?'

নাতাশা আনন্দে ঘাড় নাড়ে। হাসতে হাসতে তারা সব রাত্রির অন্ধকারে কোথায় চলে গেল, মা ভেবেই ঠিক করতে পারেন না।

তারা সব চলে গেলে মা হাসিমুখে ছেলেকে জানান,—'হ্যাঁরে, ওরা তো সবাই চমৎকার ছেলে? আহা, লিটিল রাশিয়ান্ ছেলেটীর জন্মে বড্ড মন কেমন করছে! ওর নিজের মা ছোটবেলায় মারা গিয়েছে, আমাকে বলছিল। আর ঐ মেয়েটী, নাতাশা নাম, না? আহা, কি সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটী। ও কে রে?'

পাভেল ঘরের ভেতর পায়চারী করতে করতে জবাব দেয়,—'স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।'

স্নেহভরা কণ্ঠে মা জিজ্ঞাসা করেন,—'ও খুব গরীব, না? এই ঠাণ্ডায় গায়ে সুতীর পোষাক। ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই বোধ হয়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাভেল বলে,—'না মা, আত্মীয়-স্বজন ওর আছে বৈকি! তারা কিন্তু সব বিরাট বড়লোক, মস্কো শহরে থাকে। মস্তবড় লোহার ব্যবসা আছে তাদের। বড়লোকের মেয়ে হয়ে আমাদের সঙ্গে

মিশেছে বলে ওর আত্মীয়-স্বজন ও-কে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে…'

জানালার বাইরে রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে পাভেল বলে,—বড়লোকের মেয়ে, ছেলেবেলায় কত না আদর-যত্নে মানুষ হয়েছে, যা চেয়েছে তাই পেয়েছে…আর আজ? এই শীতের রাত্রিতে বরফের মধ্যে দিয়ে ঐ পাতলা জামা গায়ে চার মাইল পথ হেঁটে চলেছে…'

মা শুনে অবাক হয়ে যান।

—'বলিস কি রে! এই রাত্তিরে চার মাইল পথ একা একা যাবে?'

—'তা যেতে হবে বৈ কি!'

—'হ্যাঁ রে, ভয় করবে না ওর?'

—'না!'

—'কিন্তু যাবার দরকারই বা কি ছিল? তুই বল্লি না কেন, ও রাত্তিরটা আমার কাছেই না হয় শুয়ে থাকতে পারতো!'

—'তা পারতো! কিন্তু সকালবেলা কেউ যদি এখানে ওকে দেখতে পেতো, তাহলে বিপদ হতো মা! আমাদের যে লুকিয়ে দেখা-শোনা করতে হয়।'

এতক্ষণ যে ভয়ের কথা মা দিব্যি ভুলে ছিলেন, পাভেলের মুখে বিপদের কথা শুনে আবার কোথা থেকে হুড়মুড় করে সেই ভয়ের জোয়ারে তাঁর মন ভরে উঠলো।

ভয়ে ভয়ে মা বলেন,—'হ্যাঁরে, খোকা! একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি…তুই যে খালি খালি বিপদের কথা বলছিস্, কিসের বিপদ? এই তো আমি তোদের সব কথা শুনলাম, এর মধ্যে বে-আইনী কি আছে? কই, কেউ তো কোন অন্যায় কাজ কিছু করলো না? তবে?'

গম্ভীরভাবে পাভেল বলে,—'আমরা কোন অন্যায় করি নি, কোন অন্যায় করবোও না। তবুও মা জান, আমাদের জন্যে খোলা রয়েছে জেলের দরজা!'

মা কিছুতেই বুঝতে পারেন না, এর মধ্যে জেলে যাওয়ার কি আছে! ভয়ে তার সারা দেহ কাঁপতে থাকে। দুহাত জোড় করে প্রার্থনা করেন—ভগবান করুন পাভেলকে যেন জেলে যেতে না হয়।



পাভেল মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—'এতদিন তোমাকে বলিনি মা, কিন্তু তোমার এখন জানা দরকার, আমরা যে কাজের ভার নিয়েছি, তাতে জেলে যেতেই হবে। ভগবানও জেল থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না, তার জন্যে তুমি দুঃখ করো না···বুঝলে? রাত হয়ে গিয়েছে, আমি ঘুমুতে চল্লাম···'

পাভেল বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

মা সারারাত জেগে প্রার্থনা করতে থাকেন,—হে ভগবান, এদের রক্ষা করো, এদেরকে তুমি দেখো।

প্রত্যেক শনিবার রাত্রিবেলায় পাভেলের ঘরে আলোচনা সভা বসে। কত নতুন নতুন লোক আসে যায়। মা তাদের কাউকেই চেনেন না। কোথা থেকে আসে—কোথায় বা চলে যায় তারা, কিছুই জানতে পারেন না তিনি।

ক্রমশ সপ্তাহে দু-তিন দিন করে সভা বসতে থাকে। পাভেলের ছোট্ট ঘর লোকে ভরে ওঠে। মা অবাক হয়ে তাদের কথাবার্তা শোনেন। মাঝে মাঝে তারা সকলে মিলে গান গায়, কিন্তু চাপা গলায়। সে গানের কথা ও সুর মার কাছে সম্পূর্ণ নতুন লাগে। গান গাইবার সময় তাদের চোখে, মুখে, কণ্ঠ-স্বরে এমন একটা নিবিড় অনুরাগ ফুটে ওঠে, মা অবাক হয়ে দেখেন, শোনেন। মনে হয় তারা যেন উপাসনা করছে! কিন্তু মা ভেবে পান না, ওরা ত গির্জায় যায় না, অথচ ওরা মনে হয় কারও উপাসনা করে। ভারি অবাক লাগে তার।

ক্রমশ মা দেখেন, তাঁদের ঘরে ছেঁড়া ময়লা পোষাক পরা কারখানার মজুরেরা সব আসতে আরম্ভ করেছে। পাভেল আর তার বন্ধুরা তাদের কি সব পড়ে শোনায়। সেই কথা শুনতে শুনতে তাদের মুখ চোখ আনন্দে উৎসাহে জ্বলে উঠে। উত্তেজিত হয়ে তারা সকলে মিলে চীৎকার করে ওঠে,—'দীর্ঘজীবি হোক্ ফ্রান্সের শ্রমিকেরা।'

কখনো বা বলে,—'দীর্ঘজীবি হোক্ ইতালীর শ্রমিকেরা!'

মা বুঝতে পারেন না, কারাই বা ফ্রান্সের শ্রমিক, কারাই বা ইতালীর শ্রমিক, আর কেনই বা তাঁর ছেলে এবং অন্যেরা এমন

উত্তেজিত হয়ে তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করছে।

তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মা আস্তে আস্তে বুঝতে পারেন, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, বা ইংলণ্ড, তাঁদের রাশিয়ার মতনই সব দেশ। বুঝতে পারেন, রাশিয়ার গরীব দুঃখী লোকদের মতন ঐ সব দেশেরও গরীব দুঃখী লোকদের জন্যে তার ছেলেরা ভাবছে। কি করে সেই সব দেশের দুঃখী লোকদের দুঃখ দূর হবে, তারই কথা তাঁর ছেলেরা আলোচনা করছে। তাদের কথাবার্তা শুনে মার মনে হতো, সেই দূর-দূরান্তের দেশের সব লোকেরা যেন তাঁর ছেলের অন্তরের বন্ধু। তাঁর সেই ছোট্ট ঘরটা যেন পৃথিবীর নানান দেশের দুঃখী লোকে ভরে রয়েছে। তাদের সমবেদনায় তাঁর ছেলে আর তার বন্ধুদের মন ভরে উঠছে। কখনও নিঃশব্দে মার মনও সেই সমবেদনায় দুলে ওঠে। যাদের কখনও চোখে দেখেন নি, যাদের চেনেন না, তাদের দুঃখে তাদের ব্যথায় তাঁর মনও কেঁদে ওঠে। এমন করে পরের জন্যেতো কোন দিন তাঁর মন কেঁদে ওঠেনি! মা স্পষ্ট বুঝতে পারেন, তাঁর মনের ভেতরেও যেন কিসের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটছে।

একদিন লিটল রাশিয়ানকে আড়ালে ডেকে মা বলেন,—'তোরা তো বাছা দেখছি ভারী মজার লোক! সবাই দেখি তোদের বন্ধু! য়িহুদীরাও তোদের বন্ধু, জার্মানরাও তোদের বন্ধু, আবার চোর-ডাকাতও তোদের বন্ধু, যাদের চিনিস্ না, জানিস্ না, তারাও তোদের বন্ধু?'

লিটল রাশিয়ান আবেগভরা কণ্ঠে বলে,—'মা আমরা ত মানুষ, তাই পৃথিবীর সব মানুষই আমাদের বন্ধু। সবার জন্যে যেমন আমরা, আমাদের জন্যেও আছে আর সবাই, এই হলো আমাদের বিশ্বাস। আমাদের পৃথিবীতে আলাদা কোন জাত নেই, আলাদা কোন দেশ নেই। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আছে শুধু দু'দল মানুষ। একদল হলো আমাদের বন্ধু, আর একদল হলো আমাদের শত্রু। পৃথিবীতে যেখানে যত শ্রমিক আছে, যত চাষী আছে, যত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আছে, তারা হলো আমাদের বন্ধু। আর পৃথিবীতে যত ধনী আছে, যত



মহাজন, জমিদার, সুদখোর আছে, যারা অপরের শ্রম ভাঙ্গিয়ে টাকা রোজগার করে, তারা হলো আমাদের শত্রু। তাই পৃথিবীতে যেখানে আছে সর্বহারার দল, যেখানে আছে দুঃখী মানুষ, তাদের সকলকে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে পৃথিবী-জোড়া এক-ভ্রাতৃত্বের আর সাম্যের রাজ্য। এই আদর্শ, এই বিশ্বাসই আমাদের মনে দেয় আলো, দেহে দেয় শক্তি। দ্বিতীয় সূর্যের মতন এই আদর্শ ভরে তুলছে আমাদের জীবনকে আশার আলোয়, জাগিয়ে তুলছে এক নতুন স্বর্গের স্বপ্ন। সে স্বর্গ কোথায় জান মা? এই আমাদের বুকে, বঞ্চিত মানুষের বুকে আছে সে স্বর্গ। তাই, সে যেই হোক্‌, যেদেশেই থাকুক, যাই হোক্‌ তার নাম, সে যদি সাম্যবাদী হয়, তাহলে সে আমাদের বন্ধু, অন্তরের মিতা যুগ-যুগান্তরে···।'

মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন লিটিল রাশিয়ানের মুখের দিকে। দেখেন, কিসের আলোয় যেন ঝলমল করছে তার মুখ।

মা যতই লিটিল রাশিয়ানকে দেখেন, ততই ছেলেটির জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের ছেলে ধীরে ধীরে যেমন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, তেমনি কোথা থেকে এই পরের ছেলেটি তাঁর কাছে যেন আপনার হয়ে আসছিল। ছোট ছেলের মতন সে মার কাছে এসে বায়না করতো, মার হয়ে উনুনের কাঠ কেটে দিতো, রান্নাঘরে এটা-ওটা করে মাকে সাহায্য করতো। তার দিকে চেয়ে মার মনে স্নেহ উথলে উঠতো। আহা, ছেলেটির নিজের মা নেই! সেই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই মার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়তো!

একদিন পাভেলকে ডেকে মা বল্লেন,—'হ্যাঁরে, রোজ কতদূর থেকে লিটিল রাশিয়ানকে এখানে আসতে হয়···আমি বলি কি তুই ওকে বল্‌ না, ও যাতে আমাদের এখানে থাকে! তাহলে তো ওকে আর ছোটাছুটি করতে হয় না।'

পাভেল উৎসাহও দেখায় না, আবার অমতও করে না। বলে,—'তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে ওকে বলবো!'

একদিন মা নিজেই লিটিল রাশিয়ানকে এখানে এসে থাকবার

জন্য অনুরোধ করলেন। মার অনুরোধ সে ঠেলতে পারলো না। পাভেলদের বাড়ীতেই থেকে গেল।

ক্রমশ পাভেলদের সেই ছোট্ট বাড়ীটার ওপর পাড়ার লোকজনের দৃষ্টি পড়লো, প্রায়ই ওখানে এত লোকজন আসে কেন? তারা ঘরের ভেতর বসে কি ফুস্‌ফুস্‌ করে? পাড়া-প্রতিবাসীদের কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই চলে। পাভেলদের যখন আলোচনা সভা বসে, তখন প্রায়ই বাইরের জানালা দিয়ে লোকে উঁকি মেরে দেখে, দেয়ালে কান রেখে তাদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করে। তাদের মনে নানান রকমের সন্দেহ জেগে ওঠে এবং নানান রকমের কথা তারা বলাবলি করতে থাকে।

পাভেলের মা কাজে রাস্তায় বেরুলেই, পাড়ার মেয়েরা মাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে শুরু করে,—'বলি হ্যাঁ গো পাভেলের মা, তোমাদের বাড়ীতে কি হয় গা? রোজ রোজ রাত্তিরবেলায় এত ছোঁড়াছুঁড়ির আমদানি হয় কেন? কই বাছা, আমাদের বাড়ীতে তো কেউ আসে না? তোমাদের মতলবটা কি?'

অনেকে মার মুখের ওপর নানান রকমের কুৎসা শুনিয়ে যায়। বলে,—'ছেলে সোমত্ত হয়েছে, বিয়ে দিয়ে দাও! নইলে উচ্ছন্নে যাবে!'

কেউ কেউ আবার বলে,—'পাড়ার ভেতর এ সব কি কাণ্ড? আমাদের ছেলে মেয়েরাও দেখছি এসব দেখে খারাপ হয়ে যাবে!'

শুনতে শুনতে মার মন দুঃখে ভরে ওঠে। তিনি তো জানেন, তাঁর ছেলেরা কোন অন্যায় কাজই করে না!

তাঁর বাড়ীর কাছেই থাকে একঘর কামার। একদিন কামার-গিন্নী মারিয়া মাকে ডেকে বলে,—'বলি, ও পাভেলের মা, ছেলেকে একটু সাবধানে রেখো বাছা!'

ভয়ে মার বুক কেঁপে ওঠে। জিজ্ঞাসা করেন,—'কেন ভাই?'

কামার-গিন্নী কাছে এসে বলে,—'কি সব কথা শুনছি, তোমার ছেলে নাকি কি একটা দল গড়েছে···নিজেদের মধ্যে নাকি মারামারি কাটাকাটি করে···পুলিশের লোক জানতে পারলে কিন্তু কাউকে

ছাড়বে না।'

ভয়ে মার দেহ কাঠ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে পাভেল আর লিটিল রাশিয়ানকে ডেকে বলেন,—'হ্যাঁরে, তোরা নাকি কি একটা ভয়ানক দল গড়েছিস? তোদের নাকি পুলিশে ধরবে?'

তারা দুজনে হেসে ওঠে।

মা বলেন,—'জানিস্, পাড়ার সব মেয়েরা বলাবলি করছে, এখানে যেসব মেয়ে আসে, তাদের নাকি চরিত্র খারাপ। আমি বুঝি, তারা আক্রোসে এই সব কথা বলে। তাদের সঙ্গে ত তোরা মিশিস্ না, তাই তাদের এত রাগ! তা বাবা, তোরা ভাল দেখে একটা করে মেয়ে দেখে বিয়ে কর্ না কেন?'

আবার দুই বন্ধুতে অট্টহাস্য করে ওঠে। মা তাদের মনের কোন হদিসই পান না।

একদিন রাত্রিবেলায় চারিদিক নিশুতি, মা কান খাড়া করে শোনেন দুই বন্ধুতে বিছানায় শুয়ে গল্প করছে।

লিটিল রাশিয়ান বলছে,—'কেউ না জানুক, অন্তত তুমি ত জান, নাতাশাকে আমি ভালবাসি…'

পাভেল গম্ভীরভাবে বলে,—'হাঁ জানি!'

লিটিল রাশিয়ান বলে,—'নাতাশাকে আমি সে কথা জানাতে চাই!'

পাভেল বলে,—'না'।

—'বাঃ তাতে দোষ কি?'

—'তাকে জানানো মানে তো, তাকে বিয়ে করা? বিয়ে করা আমাদের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে ঘরের স্নেহমায়া, ভালবাসা নয়। যে কাজের জন্যে, যে আদর্শের জন্যে আমাদের জীবন, তা ছাড়া সেখানে আর কোন কিছুর স্থান নাই। তুমি যদি তাকে ভালবেসে থাক, সেকথা তোমার মনেই থাক্!'

লিটিল রাশিয়ান প্রতিবাদ করে বলে,—'কিন্তু সেদিন সভায় এলেক্সি আইভানোভিচ কি বলেছিলেন, মনে নেই? তিনি বলেছিলেন, মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, চাই তার পরিপূর্ণ বিকাশ…'

গম্ভীরকণ্ঠে পাভেল বলে,—'তোমাকে তো বলেছি বন্ধু, সে-জীবন আমাদের জন্যে নয়। ভবিষ্যৎকে যারা ভালবেসেছে, তাদের কাছে বর্তমানের সুখ বলে কিছু নেই। আদর্শের জন্যে সমস্ত ব্যক্তিগত সুখকে বিসর্জন দিতেই হবে। এখন তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ভাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিটিল রাশিয়ান বলে,—'কিন্তু এ বড় কঠোর বিধান।'

পাভেল বলে,—'কঠোরতা ছাড়া সংগঠন চলে না, আর সংগঠন ছাড়া মুক্তি কোথায়?'

মা নিশ্চুপ হয়ে ছেলেদের কথাবার্তা শোনেন। মনে মনে ভাবেন, এত অল্প বয়স এদের, এরই মধ্যে এদের মন তপস্বীর মতন কঠোর হয়ে উঠেছে!

কারখানায় কারখানায় নীলকালিতে লেখা একরকমের কাগজ কে বা কারা এই সময় মজুরদের ভেতর বিলি করতে লাগলো। এইসব কাগজে মজুরদের সুখদুঃখের কথাই লেখা থাকতো; কোথায় কোন্ কারখানায় মজুররা একজোট হয়ে ধর্মঘট করেছে, কোথায় দাবী আদায় করেছে, তারই খবর এই সব কাগজে লেখা থাকতো। আর সেই সঙ্গে সব মজুরদের প্রতি আবেদন করা হতো,—মালিকদের সবরকম অবিচার অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও, কারখানায় কারখানায় সাম্যবাদী দল গঠন কর, যাতে করে সকলে একসঙ্গে মিলে ধর্মঘট করে মালিকদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়।

এই কাগজের ব্যাপার নিয়ে চারদিকে ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। সবাই বলাবলি করে, এ হলো বিপ্লবীদের কাজ। কারখানার মালিকরা উঠল ক্ষেপে,—যত ব্যাটা বদমায়েস বিপ্লবী, ধরতে পারলে বেটাদের ছাল উপড়ে নেবো! সব শ্রমিকদের ডেকে মালিকেরা স্পষ্ট করে

জানিয়ে দেয়,—যার হাতে এই কাগজ দেখতে পাওয়া যাবে, তাকে তক্ষুণি কারখানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে!

কিন্তু ছেলে ছোকরা মজুররা তাতে কিছুমাত্র ভয় পায় না। লুকিয়ে লুকিয়ে সেই সব কাগজ পড়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। নতুন কাগজ কবে পাওয়া যাবে, তার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে।

ক্রমশ পথে ঘাটে, দেয়ালে, সরাইখানায় সেই নীলকালিতে লেখা কাগজ সকলেরই দৃষ্টিতে পড়ে। সারা অঞ্চলে একটা চাঞ্চল্য জেগে ওঠে।

গাঁয়ের লোকেরা লক্ষ্য করে সরাইখানায়, চায়ের দোকানে, এক ধরণের নতুন লোক ইদানীং আসা-যাওয়া শুরু করছে তাদের এর আগে এই অঞ্চলে কেউ দেখে নি। তারা সব সময় যেন কান খাড়া করে থাকে। কে কোথায় কি বলেছে, ওৎপেতে শোনবার চেষ্টা করে। সব সময়ই তাদের চোখ যেন কি খুঁজছে। গায়ে পড়ে গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে আলাপ করে। হাজার রকমের প্রশ্ন করে। খোঁজ-খবর নেয়।

দেখে শুনে মায়ের বুক ভয়ে কাঁপতে থাকে। সেই সব নীল-কালিতে লেখা কাগজ কোথা থেকে আসে, তা জানতে তো আর তাঁর বাকি নেই। রাত্রিতে তাঁর ঘরে পাভেলের হাতেই সেই সব কাগজ তিনি দেখেছেন।

এমন সময় একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কামার-গিন্নি এসে মাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কানে-কানে বলে,—'আমি খবর পেলাম, তাই তোমাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়ে গেলাম গো পাভেলের মা, তোমাদের বাড়ীতে মনে হয় পুলিশের খানাতল্লাসী হবে।'

পুলিশের খানাতল্লাসী যে কি জিনিষ তা মা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না কিন্তু এটা বোঝেন, একটা ভয়ঙ্কর কিছু হবে। ভয়ে তাঁর সর্বদেহ কাঁপতে থাকে। কামার গিন্নী তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিয়ে চলে যায়। যাবার সময় বলে,—'দেখো ভাই, আমার কথা যেন

আবার কাউকে বলো না। তোমাদের ভালোর জন্যই তোমাকে আগে থাকতে জানিয়ে গেলাম।'

সেদিন রাত্রিতে পাভেল আর লিটিল রাশিয়ান ফিরে আসতেই মা ছুটে গিয়ে চাপা গলায় বলেন,—'জানিস?'

লিটিল রাশিয়ান হেসে জবাব দেয়,—'জানি মা! তুমি পুলিশের কথা বলছো তো?'

মা অবাক হয়ে যান,—'একি ব্যাপার? ওরা হাসছে!'

মার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে পাভেল বলে,—'মা ভয় পেয়েছ বুঝি?'

অবাক হয়ে মা বলেন,—'কি বলিসরে? ভয় পাবোনা?'

—'ভয় পাবার এতে কিছু নেই মা, রাশিয়ার ঘরে ঘরে এরকম খানাতল্লাসী অনবরত হচ্ছে!'

ছেলেদের এরকম নির্ভীক নির্বিকার ভাব দেখে মা অবাক হয়ে যান। ঘরের মাঝখানে রাশীকৃত বই আর কাগজ পড়েছিল। লিটিল রাশিয়ান আর পাভেল তাদের ভেতর থেকে কতকগুলো বই আর কাগজ সরিয়ে নিয়ে বাইরে উঠোনে মাটীর তলায় পুঁতে রাখলো। মা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেন। তাঁর কান পড়ে থাকে, বাইরে দরজার কাছে। এই বুঝি শব্দ হয়, এই বুঝি পুলিসের লোকেরা আসে। সারা রাত ভয়ে মা ঘুমুতে পারেন না। সব সময়ই তাঁর মনে হয়, এই বুঝি পুলিশের লোকেরা এলো।

পুলিশের লোকেরা এলো, প্রায় এক মাস পরে। মাঝ্‌রাতে তখন পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় বাইরে লোহাওয়ালা জুতোর আওয়াজ উঠলো। ঘরের ভেতর আলো জ্বেলে তখনও পাভেল আর লিটিল রাশিয়ান কাজ করছিল। তাদের সঙ্গে ছিল নিকোলে। ছেলেদের কথা শুনতে শুনতে মা তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছিলেন।

দরজায় দুম্‌ দুম্‌ করে ধাক্কার আওয়াজ হতে লাগলো। পাভেল উঠে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলো,—'কে?'

দরজা খোলা পেয়েই দুজন পুলিসের লোক ধাক্কা মেরে পাভেলকে

ফেলে দিয়ে সোজা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লো। পাভেল উঠে দাঁড়াতেই একজন দীর্ঘকায় লোক হাসতে হাসতে বলে উঠলো,—'ভেবেছিলে বুঝি তোমার কোন বন্ধু লোক এসেছে না? ইস আমাদের দেখে বড়ই হতাশ হয়েছ মনে হচ্ছে? কি বল?'

পাভেল তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে একজন পুলিশ লাঠির গুঁতো দিয়ে মাকে ঠেলে তুলছে আর চীৎকার করে বলছে—'এই বুড়ী ওঠ...বাড়ী খানাতল্লাসী হবে।'

আর একজন পুলিশ পাভেলকে দেখিয়ে সেই দীর্ঘকায় লোকটাকে বলে, 'হুজুর এই ছেলে সেই পাভেল আর এই বুড়ী হলো ওর মা!'

মা কাঁপতে কাঁপতে ছেলের পাশে এসে দাঁড়ান।

পুলিসের লোকেরা ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর সমস্ত জিনিষপত্র তচনচ করে উলটে পালটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বইগুলো নিয়ে উলটে পালটে দেখে বাইরের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে।

দাঁতে দাঁত দিয়ে নিকোলে বলে,—'বইগুলো এ-রকমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবার কি দরকার?'

দীর্ঘকায় ইন্‌সপেকটর ধমক দিয়ে ওঠে,—'চোপরও পাজী?'

তারপর পাভেলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'এই বাইবেল কে পড়ে?'

পাভেল শান্ত স্বরে উত্তর দেয়,—'আমি!'

—'এসব বই কার?'

—'আমার!'

—'হুঁ!'

এবার ইন্‌সপেকটরের দৃষ্টি নিকোলের ওপর গিয়ে পড়ে। নিকোলেকে সে লিটিল রাশিয়ান বলে ভুল করে। তাই জিজ্ঞাসা করে,—'মশাই এর নামই বোধ হয় আন্দ্রি নাখোদকা?'

নিকোলে গম্ভীরভাবে বলে,—'হাঁ!'

তাই দেখে লিটিল রাশিয়ান এগিয়ে এসে বলে,—'আপনি ভুল করছেন, আমারই নাম আন্দ্রি নাখোদকা।'



ইন্‌স্‌পেকটর লিটিল রাশিয়ানের আপাদমস্তক একবার দেখে নেয়। চীৎকার করে বলে,—'এই নাখোদকা, এর আগে আর ক'বার জেল খেটেছিস ?'

লিটিল রাশিয়ান জবাব দেয়,—'দু-বার। কিন্তু তারা আমাকে এই নাখোদকা বলে ডাকতো না, তারা ডাকতো মিঃ নাখোদকা বলে !'

ইন্‌স্‌পেকটর ব্যঙ্গ করে ওঠে,—'মাপ করবেন হুজুর, মিঃ নাখোদকা বলে আমিও আপনাকে ডাকবো এরপর থেকে। তা মিঃ নাখোদকা, কারখানায় কারখানায় কোন্ বদমায়েস শুয়োর এই সব কাগজ বিলি করে বেড়াচ্ছে, সেটা বলতে পারেন হুজুর ?'

লিটিল রাশিয়ান উত্তর দেবার আগেই নিকোলে জোরে বলে উঠলো,—'বদমায়েশ লোকদের সঙ্গে আমাদের কারবার নেই। বদমায়েশ লোক কাদের বলে, তা আজ এই প্রথম আমরা এখানে দেখছি···আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ··।'

সমস্ত ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায় ! মার মুখ ভয়ে শুকিয়ে আসে !

নিকোলের সেই উদ্ধত উত্তরে ইনস্‌পেকটর রাগে লাল হয়ে ওঠে। একজন পুলিসের লোককে ডেকে হুকুম দেয়,—'এই মুহূর্তে কুকুরটাকে ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে যা···'

দুজন পুলিশ টানতে টানতে নিকোলেকে বাইরে নিয়ে যায়।

সমস্ত ঘর-দোর ওলোট পালট করে তল্লাসী চলে, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় না। ইনস্‌পেকটর হাসতে হাসতে বলে,—'কিছু যে পাওয়া যাবে না, তা আমি আগেই জানতাম ! এই দলের মধ্যে রীতিমত একজন ঘুঘু বদমায়েশ আছে···কিন্তু সে কত বড় ঘুঘু তা আমিও দেখে ছাড়বো।'

এই বলে একজনকে ইঙ্গিত করতেই একজন পুলিশ হাতকড়া নিয়ে লিটিল রাশিয়ানের দিকে এগিয়ে যায়। ইনস্‌পেকটর ব্যঙ্গের সুরে বলে,—'এই যে মিঃ আন্দ্রি নাখোদকা, আপনি অতঃপর আমাদের বন্দী হইলেন !'

লিটিল রাশিয়ান বলে,—'কেন ? কি কারণে জানতে পারি কি ?

ইনস্‌পেকটর তেমনি ব্যাঙের সুরে বলে,—'নিশ্চয়ই যথাসময়ে হুজুরকে তা জানানো হবে বৈ কি!'

তারপর মার দিকে চেয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে,—'এই বুড়ী লিখতে পড়তে জানিস?'

যদিও ভয়ে মার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, তবুও লোকটার ব্যবহার দেখে ঘৃণায় তাঁর মন কঠিন হয়ে উঠছিল। ইনস্‌পেকটরের সেই রূঢ় প্রশ্নে মা বলেন,—'অত চেঁচাচ্ছ কেন বাছা? অপরের দুঃখকষ্ট কি এতটুকুও তোমরা বোঝ না?'

পাছে পুলিশ মাকে কোন অপমান করে এই আশঙ্কায় লিটিল রাশিয়ান মাকে ডেকে বলে,—'মা, তুমি কোন কথা বলো না, এ সমস্ত ব্যাপারে দাঁতে দাঁত দিয়ে বুকের ব্যথা চেপে রাখতে হয়।'

সে কথায় কান না দিয়ে মা ইনস্‌পেকটরের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন,—'হ্যাগা বাছা, কেন তোমরা এ রকম করে ঘরের ছেলেদের ছিনিয়ে নিয়ে যাও।'

ইনস্‌পেকটর ধমক দিয়ে ওঠে,—'চুপ্ কর্ বুড়ি!'

মা অসহায়ভাবে কেঁদে ওঠেন।

ইনস্‌পেকটর হেসে ওঠে। বলে,—'বড় আগে থাকতে কাঁদছিস্ যে বুড়ী! আরে কান্নার এখনই হয়েছে কি!'

কাঁদতে কাঁদতে মা বলেন,—'অভাগী মায়েদের চোখের জলের কি কোনো শেষ আছে!'

তল্লাসী শেষ করে পুলিশ লিটিল রাশিয়ান আর নিকোলেকে ধরে নিয়ে যায়।

যত দিন যায়, পাভেল সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকেদের ধারণা ততই বদলাতে থাকে। কারখানার কুলীমজুর থেকে আরম্ভ করে গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও পাভেলকে রীতিমত খাতির করতে শুরু করে। তাদের সুখ-দুঃখের সব কথা পাভেলকে এসে বলে, বিপদে পড়লে পাভেলের কাছে

ছুটে আসে, পাভেলও যথাসাধ্য সকলের হয়ে বুক পেতে দেয়। বুড়ো লোকেরাও ঘাড় নেড়ে বলে,—বয়স অল্প হলে কি হবে, এমন বুদ্ধিশুদ্ধি, এমন পড়াশোনা কজনেরইবা আছে?

ছেলের প্রশংসায় মার মন গর্বে ভরে ওঠে। ছেলের প্রত্যেক কথা তিনি মন দিয়ে শোনেন, বুঝতে চেষ্টা করেন, নতুন নতুন বহু কথাই তিনি ছেলের কাছ থেকে জানতে পারেন। আনন্দে তাঁর মন ভরে ওঠে।

কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকদের এই সময় নতুন করে আবার ঝগড়া বাঁধলো। কারখানার পেছনে একটা জলাভূমি ছিল, সেই জলাভূমি ভরাট করা কারখানারই দায়িত্ব। কিন্তু কারখানার ম্যানেজার ঠিক করলো, ভরাট করবার কাজে যে টাকা লাগবে, তা শ্রমিকদের মাইনে থেকেই কেটে আদায় করে নেওয়া হবে। তিন বছর আগে ঠিক এই রকম আর একবার শ্রমিকদের স্নানের জায়গা করে দেবার অছিলায় শ্রমিকদের মাইনে থেকে তিনহাজার আটশো রুবল আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্নানের কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয় নি, আর সে টাকার কোন হিসাবও ম্যানেজার শ্রমিকদের দেয় নি।

শ্রমিকরা ঠিক করলো, তারা কিছুতেই এবার ম্যানেজারের মতলবে সায় দেবে না, কিন্তু কিভাবে তা করা যায়, তার জন্য তারা পাভেলের কাছে এসে সবাই উপস্থিত হলো। সমস্ত কথা শুনে পাভেল বললো,—কিছুতেই তোমরা এই চাঁদা দিয়ো না!'

শ্রমিকরা চলে গেলে, পাভেল মাকে ডেকে বললো,—'মা, আমার শরীরটা আজ খারাপ লাগছে, আমি শহরে যেতে পারছি না, আজ আমার হয়ে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। শহর থেকে যে আমাদের একটা খবরের কাগজ বেরোয়, সেকথা তো তোমাকে আগে বলেছি। সেই খবরের কাগজের অফিসে আমার একটা লেখা দিয়ে আসতে হবে। দেখবে কেউ যেন জানতে না পারে। পারবে তো?'

মা তক্ষুণি রাজী। তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিলেন। আনন্দে তাঁর মন নেচে উঠলো, এই প্রথম ছেলে তাঁকে তার

কোনো কাজের ভার দিচ্ছে। ছেলের কাজে তিনি যে লাগতে পারেন, এই কথা ভাবতেই তাঁর মন খুশীতে ভরে উঠলো। পাভেল তাঁকে অযোগ্য মনে করে না।

কাজ সেরে মা ফিরে এলেন। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করার দরুণ তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সে ক্লান্তি আজ তাঁর গায়েই লাগছে না। বাড়ী ফিরে তিনি ছেলের কাছে সগর্বে সব বর্ণনা করতে লাগলেন। সেখানে কার কার সঙ্গে দেখা হলো, কে কি বল্লো! একটি মেয়ের কথা বিশেষভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল। তাই পাভেলকে বল্লেন,—'দেখ একটি নতুন মেয়ের সঙ্গে সেখানে আলাপ হলো—শাশান্কা নাম তার, আহা, কি চমৎকার মেয়ে রে! দেখলুম তোকে খুব ভালবাসে, তোকে তার নমস্কার পাঠিয়েছে! আর সেই যে আইভানোভিচের গল্প করিস্, তার সঙ্গেও আলাপ হলো, খাসা লোক!'

পাভেল মনে মনে খুশী হয়। একটু একটু করে মার মনের ভয় যে ভেঙ্গে যাচ্ছে, তাতে সে তৃপ্ত বোধ করে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—ওদের সবাইকে তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুব আনন্দ হলো মা!'

তার পরের দিনও শরীর ভাল না থাকায় পাভেল কারখানায় যেতে পারলো না। দুপুরের দিকে হঠাৎ ফিদিয়া বলে কারখানার একটা ছেলে ছুটে পাভেলের বিছানার পাশে এসে বললে,—'শীগগীর চলো, তোমাকে এক্ষুণি কারখানার মাঠে যেতে হবে··কারখানার লোকেরা সব কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে···হুলুস্থুল ব্যাপার।'

পাভেল অসুখের কথা ভুলে গিয়ে তক্ষুণি গায়ের জামাটা টেনে পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। মা দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। গোলমালের কথা শুনে মার বুকের ভেতরটা কি রকম করে উঠলো। পাভেলের কাছে গিয়ে বল্লেন,—'হ্যাঁরে, আমি কি সঙ্গে যাব ?

তারপর নিজেই বলে উঠলেন,—'নিশ্চয়ই যাবো! কি বলিস্? আমারও যাওয়া উচিত।'

পাভেল বলে,—'এসো।'

মা পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার দিকে এগিয়ে চলেন। না জানি,

সেখানে কি গণ্ডগোল হচ্ছে, কি অজানা বিপদই না সেখানে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু একটি ভরসার কথা, যাই হোক্, তিনি তো ছেলের পাশেই আছেন! বিপদের মধ্যে আজ ছেলের পাশে এসে যে দাঁড়াতে পারলেন, এই আনন্দ আর গর্বে তাঁর মন শক্ত হয়ে উঠলো।

কারখানার মাঠ তখন লোকজনে ভরে গিয়েছে। পাভেল আর মা ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দেখেন, রাইবিন তখন কারখানার মজুরদের ডেকে বক্তৃতা দিচ্ছে। রাইবিন্ নিজেও এই কারখানার এক জন মজুর। সে উত্তেজিত হয়ে বলছিল,—'বারবার মুখ বুঁজে আমরা কারখানার মালিকদের হাজার রকম অত্যাচার সয়ে এসেছি। আজ আর সইবো না। তার জন্যে দরকার, সকলে মিলে এক সঙ্গে প্রতিবাদ করা! আমরা আজ তাই করবো।

জলাভূমি ভরাট করবার কাজে ম্যানেজার আমাদের মাইনে থেকে যে টাকা কাটবার আদেশ দিয়েছিল, তারই প্রতিবাদে আমরা মজুররা আজ এই সভা করছি।'

পাভেলকে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠলো,—'আমরা পাভেলের কাছ থেকে শুনতে চাই, আমাদের এখন কি করা উচিত?'

জনতার উৎসাহে দেখে পাভেলের মনে সুগভীর একটা আশা জেগে উঠলো। এতদিনের চেষ্টার ফলে আজ তারা মুখ ফুটে সাহস করে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এতদিন যে তারা বোবা হয়ে ছিল আজ যেন হঠাৎ তাদের মুখে কথা ফুটেছে। পাভেলের মনেও উৎসাহের আগুন জ্বলে ওঠে, মনে মনে সে স্থির করে. আজ এই জনতার কাছে প্রয়োজন হলে সে তার জীবন উৎসর্গ করে যাবে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে শুরু করে:

—'ভাইসব, এ শুধু আজকের সমস্যা নয়, আজকের কথা নয়, যে অত্যাচার আমরা যুগ যুগ ধরে সয়ে এসেছি, যে অত্যাচার যুগ যুগ ধরে এখনো চলছে, তারি বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হবে।

প্রাণের আবেগে সে বলে চলে—

—সাথী ভাইরা, আমরা আমাদের এই দুহাত দিয়েই ত গড়েছি গির্জা আর কারখানা, আমাদের এই হাতে আমরা ভেঙেছি কয়লা, পুড়িয়েছি লোহা, গড়েছি টাঁকশাল, গড়েছি টাঁকশালার টাকা, কারখানায় কারখানায় গড়েছি যন্ত্র, গড়েছি সভ্যতার হাজার রকম আসবাবপত্র। আমরা খেটেছি বলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি বলে, মাঠে মাঠে ভরে উঠেছে শস্য, মানুষের ঘরে জুটেছে অন্ন, ফুটেছে আনন্দ, আর আমরাই কাটাচ্ছি দিন—উপবাসে আর নিরানন্দে। সকলকালে সকলদেশে আমরাই ত ছুটে গিয়ে আগে হাত দিয়েছি কাজে, আর সকলকালে সকল দেশে আমরাই পড়ে আছি জীবনের সব শেষে।

জনতার ভেতর থেকে কেউ ঠাট্টা করে ওঠে, কেউ বা বাহাবা দেয়।

পাভেল বলে চলে,—'আজ আমাদের বাঁচতে হলে আমাদের একসঙ্গে মিলে প্রতিবাদ করতে হবে। সকলের জন্যে আমরা প্রত্যেকে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য সবাই এই হোক আজ আমাদের একমাত্র নীতি।'

জনতা স্তব্ধ হয়ে পাভেলের কথা শোনে। এমনভাবে তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা এর আগে তারা আর কখনো শোনে নি।

সভায় ঠিক হয় যে পাভেল, রাইবিন আর একজন শ্রমিক কারখানায় গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে সামনাসামনি আলোচনা করবে। এমন সময় পেছন দিক থেকে একটা আওয়াজ কানে আসে—ম্যানেজার,—ম্যানেজার ··আসছে ··

দুই পাশ থেকে ভিড় যেন ভয়ে সরে যায়, তার মধ্যে দিয়ে গম্ভীর মুখে ম্যানেজার স্বয়ং ভেতরে এগিয়ে আসে। কট্‌মট্‌ করে চারদিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে,--'এখানে এত ভিড় কেন? এর মানে কি?'

পাভেল উত্তর দেয়,—'এভাবে চাঁদা দিতে আমরা পারবো না।'

ম্যানেজার বলে,—'কেন পারবে না, কেন? এতো তোমাদের ভালোর জন্তেই হচ্ছে!'

পাভেল জোরের সঙ্গে বলে,—'আমাদের ভাল করবার ইচ্ছে সত্যিই যদি মালিকদের থাকে, তাহলে এ টাকাটা তাঁদেরই তো

দেওয়া উচিত।'

ম্যানেজার গর্জন করে উঠে বলে,—'কারখানাটা দানছত্র নাকি হে? এ সব চলবে না···ভাল চাও তো, এক্ষুণি সব কাজে যাও।'

পেছন থেকে কে একজন বলে ওঠে,—কাজ করতে হয় তো আপনি একাই করুন গে যান না।

ম্যানেজার রাগে গর্‌ গর্‌ করতে করতে চলে যায়। যাবার সময় জানিয়ে দিয়ে যায়, পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হল, এর মধ্যে যে কাজে হাত না দেবে, তাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে!

ম্যানেজারের এই কড়া হুকুম শুনে জনতার মধ্যে অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। কাজ কি বাবা গোলমালে! যদি তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক আনে? তখন কে দেখবে? পাভেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেই সব কথা শোনে। বুঝতে পারে, তার বক্তৃতা এদের মনে তেমনভাবে দাগই কাটতে পারে নি।

ক্রমশ একজন দুজন করে কারখানার ভেতর ঢুকতে থাকে। বুড়ো যারা তারা গম্ভীরভাবে পাভেলকে পরামর্শ দিয়ে যায়,—মালিকদের সঙ্গে লড়াই করে আখেরে কোন লাভ হবে না বাবা!

পাভেল পাথরের মতন দাঁড়িয়ে সব শোনে। তার মন হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ে। এক মুহূর্ত আগে তাদের যা উৎসাহ ছিল, তা কোথায় গেল? এরা কেন তার কথা শুনলো না? হয়ত যে-ভাবে, যে-ভাষায় বললে তারা জেগে উঠতো, সে-ভাবে বলতে বা সে-ভাষা এখনো সে আয়ত্ত করতে পারে নি! কিম্বা এতদিন ধরে মানুষের শক্তির উপর যে বিশ্বাস করে এসেছে, সে বিশ্বাস কি তবে ভুল? যাদের দুঃখের জন্য সে এত সাধ্যসাধনা করছে, তারা সে সম্বন্ধে কি একেবারেই অচেতন? সারা রাত তার চোখে ঘুম আসে না। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে ভাবে, কি করে এই অচেতনকে জাগানো যায়?

মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় নিস্তব্ধ রাত্রিতে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেই শব্দে মার ঘুম ভেঙে গেল। পাভেল

দরজার কাছে এসে দেখে, সামনেই পুলিশ।

পাভেল তাড়াতাড়ি মার কাছে এসে কানে-কানে বলে,—'মা ওঠ, আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে···বুঝেছ ?'

মা স্থির কণ্ঠে বলেন,—'বুঝেছি।' বিছানা থেকে উঠতেই দেখেন ছ দিক থেকে ছুজন পুলিশ পাভেলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বুক ফেটে কান্নার জোয়ার জেগে ওঠে। কিন্তু পুলিশের সামনে কাঁদতে কে যেন তাকে ভেতর থেকে বারণ করলো, মা বহু কষ্টে কান্না সম্বরণ করলেন। পুলিশের লোকেরা পাভেলকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। একবার মার মনে হলো ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, কিন্তু ছেলের শান্ত মুখ দেখে তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। স্থিরকণ্ঠে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন,—'সঙ্গে কি কিছু তোর চাই খোকা ?'

পাভেল হেসে বলে,—'না, মা।'

দরজা দিয়ে পাভেল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়···

তাকে উদ্দেশ্য করে মা বলেন,—'সবার ওপরে যিনি রয়েছেন, তিনিই থাকবেন তোর সঙ্গে।'

শূন্য ঘরে মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এতক্ষণ যে কান্নাকে চেপে রেখেছিলেন, বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মতন তা ধেয়ে এলো। কতক্ষণ ধরে যে সেই ভাবে কেঁদেছিলেন, তার কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। কান্নার শেষে ক্লান্ত হয়ে নিজের দিকে ফিরে চান, জীবনে তিনি এই প্রথম বুঝতে পারেন, কত অসহায় তিনি।

শূন্য একলা ঘরে চোখের জলে মার দিন কেটে যায়।

একদিন পাভেলের বন্ধু রাইবিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। রাইবিনও কারখানার একজন মজুর।

রাইবিনকে মা বলেন,—'তোমাদের জন্যই সে জেলে গিয়েছে। তোমাদের সকলের উচিত একজোট হয়ে তার পক্ষে দাঁড়ানো।'

রাইবিন হেসে ওঠে। বলে,—'মা তুমি যা বলছো, তা সত্যি। কিন্তু আমরা যে অমানুষ হয়ে গিয়েছি। অপরের ছুঃখ সম্বন্ধে আমরা কিরকম হয়েছি জান ? সজারু জানো তো ? সজারুর-কাঁটা গায়ে

কাঁটা। তেমনি আমাদের প্রত্যেকের গায়েও কাঁটা ভর্তি। তাই পরস্পর কাছাকাছি হলেই এর কাঁটা ওর গায়ে গিয়ে বেঁধে, সেই জন্যেই এক সঙ্গে থাকতে পারি না, এক সঙ্গে কাজ করতে পারি না!'

পাভেলের বন্ধুদের মধ্যে এই রাইবিন ছেলেটাকে মা তত পছন্দ করতেন না, কারণ তার কথাবার্তা ভাল করে বুঝতে পারতেন না। পাভেলের অন্য বন্ধুরা কেমন আশার কথা বলে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলে। কিন্তু রাইবিনের মুখে সব সময়ই যেন হতাশার কথা, ভয়ের কথা।

তাই সেই দুঃখের মধ্যে রাইবিনের কথা তাঁকে আরো উতলা করে তোলে। যাদের জন্যে তাঁর ছেলে জেলে গেল, তারা তার জন্যে কিছু করবে না?

দুঃখে, ভাবনায় মা রান্নাবান্নার পাট তুলে দিয়েছিলেন। সারাদিনের পর সন্ধ্যেবেলায় দুএক টুকরো রুটী খেয়েই শুয়ে পড়তেন। যতক্ষণ জেগে থাকতেন, শুধু ভাবতেন পাভেলের কথা, আর লিটিল রাশিয়ানের কথা। তাঁর মাতৃ-হৃদয় লিটিল রাশিয়ানকে নিজের ছেলের মতই মনের ভেতরে টেনে নিয়েছিলো। ভাবতেন আর অসহায় বেদনায় তাঁর দুচোখ ভরে আসতো লোনা জলে।

একদিন সন্ধ্যে বেলা, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় দরজায় কে যেন আস্তে আস্তে টোকা মারলো। দরজা খুলে দিতেই দুটী যুবক প্রবেশ করলো। একজন হলো সামোলভ, পাভেলের বন্ধু, মা চিনতেন তাকে। সামোলভ ঘরে ঢুকেই সঙ্গীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মাকে বললো,—'একে চিনতে পারছেন তো মা? সেই যে খবরের কাগজের অফিসে যার কাছে পাভেলের লেখা নিয়ে গিয়েছিলেন? আইভানোভিচ্...এবারে চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই! পাভেলের সহকর্মী...'

টুপি খুলে আইভানোভিচ্ মাকে অভিবাদন করে বলে,—'মা, একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এসেছি। তার আগে আপনাকে একটা সুখবর দিই...আমাদের একজন বন্ধু কাল জেল

থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার কাছ থেকে শুনলাম, পাভেলরা ভালই আছে। আর লিটিল রাশিয়ান আপনাকে ভালবাসা জানিয়েছে।

সেইটুকু সংবাদেই মার মন আনন্দে ভরে ওঠে। যেন বুক থেকে মস্ত বড় বোঝা কে নামিয়ে দিলো।

আইভানোভিচ্ হেসে বলে,—'পাভেল কি বলে জানেন মা? আমাদের কাজে জেল হলো বিশ্রামের জায়গা। অনবরত খাটতে খাটতে মাঝে মাঝে বিশ্রামের দরকার হয়। তাই জেলে গিয়ে মাঝে মাঝে সেই বিশ্রাম সুখটা উপভোগ করতে হয়। জানেন মা, সেদিন আমাদের দলের আরও কত ছেলে ধরা পড়েছে? মোট উনপঞ্চাশ জন!'

মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, তাহলে তাঁর ছেলে একলা জেলে নেই ·· উনপঞ্চাশ জন বন্ধু তারা একসঙ্গে আছে! জেল যে কি বস্তু, তার কোন ধারণাই মার ছিল না তাই উনপঞ্চাশ জনের সংবাদে মা আশ্বস্তই হন, তাঁর ছেলেত আর একলা নেই।

আইভানোভিচ্ চুপি চুপি বলে,—'এবার কাজের কথাটা বলি। পাভেলকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। এখন যদি আমাদের প্রচারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুলিশের স্পষ্ট বিশ্বাস হবে যে, এই সবই হলো পাভেলের কাজ। তখন তার ওপর নির্মম অত্যাচার চলবে আর তাকে জেল থেকে ছাড়বেই না···'

মা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁর মুখ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে পড়ে,—'তাহলে উপায়?'

আইভানোভিচ মাকে আশ্বস্ত করে বলে,—'উপায় নিশ্চয়ই আছে। সে থাকতে কারখানায় কারখানায় যেমন প্রচারের কাজ হতো, তার অনুপস্থিতিতেও সেই কাজ তেমনিভাবে চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে পুলিশ বুঝবে, পাভেল নয়, অন্য আরো লোকও এর পেছনে আছে।

এখন কথা হলো, আমাদের দলের অনেকেই ধরা পড়েছে। কার-খানার ভেতরে যারা আমাদের লোক ছিল, তারা প্রায় সবাই ধরা

পড়েছে। আমি লিখতে পারি, বই-এরও ব্যবস্থাও করতে পারি, কিন্তু কারখানার ভেতরে সেগুলো বিলি করবার জন্য একজন লোকের দরকার, যে লোককে পুলিশের লোকেরা সহজে সন্দেহ করতে পারবে না। আজকাল কারখানার ম্যানেজারেরা ভয়ানক কড়াকড়ি করছে, কারখানার ভেতরে কোন অজানা লোককে ঢুকতেই দেয় না, ঢোকবার সময় গেটে সবাইকে সার্চ করে! সেইজন্য আমি এক মতলব করেছি।'

মা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'কি? কি সে মতলব?'

—'মেরিয়ানা বলে একজন বুড়ী খাবার-ওয়ালী আছে, তাকে তো আপনি চেনেন ত?'

--'হাঁ চিনি বই কি!'

—'তাকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে পারেন, তাহলে তার সাহায্যে অনায়াসেই কারখানার ভেতর কাগজপত্র চালান দেওয়া যেতে পারে!'

মার ভেতর থেকে যেন বলে উঠলো,—না, এ মতলব ঠিক নয়। মা বললেন,—'ও বুড়ী বড্ড বক্‌বক্ করে, পেট আলগা···ওকে দিয়ে এসব কাজ হতে পারবে না!'

হঠাৎ মার মনে একটা কথা জেগে উঠলো। উল্লাসে তিনি বলে উঠলেন,—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি নিজেই এই কাজ করতে পারবো। তোমাদের বইপত্র, যা কিছু বিলি করবার সব আমাকে দাও, আমি যাব কারখানার ভেতরে। মেরিয়ানাকে বলবো, তার সঙ্গে আমাকে নিতে···একলা একলা ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না। তার সঙ্গে তার কাজের সাহায্য করবো! বুড়ী নিশ্চয়ই রাজী হবে! তখন তার বদলে আমি কারখানায় মজুরদের কাছে খাবার বিক্রী করতে যাবো···আমার ছেলেকে জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছে, পেটের দায়ে আমাকে যা হোক্ একটা কাজ তো করতে হবে? কেউ আমায় সন্দেহ করতে পারবে না!'

আনন্দে তারা দুই বন্ধু চীৎকার করে ওঠে,—চমৎকার! জগতে

চিরকাল এমনিধারা জেগে থাকুক মায়ের অন্তর, মায়ের ভালবাসা।"

পরের দিনই মা মেরিয়ানার কাছে গিয়ে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। বুড়ী মেরিয়ানা সব ব্যাপারই জানতো। মায়ের চোখের জলে তার নারীহৃদয় দুলে উঠলো। দুজনে মিলে বন্দোবস্ত করলো —মেরিয়ানার হয়ে মা-ই কারখানার ভেতর খাবার বিক্রী করবেন, আর সেই সময়টা মেরিয়ানা পথে পথে ফেরি করে আরো কিছু খাবার বিক্রীর ব্যবস্থা করবে। সহজেই মার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল।

পবদিন থেকেই মা মাথায় খাবারেব চুবড়ী নিয়ে কারখানায় মেরিয়ানার জায়গায় গিয়ে বসলেন। নতুন খাবারওয়ালীর সঙ্গে কারখানার মজুরদের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ আলাপ হয়ে গেল। পাভেলেব মা বলে কেউ কেউ সহানুভূতিও দেখাতো—আবার মজুরদের মধ্যে কেউ কেউ মাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতো। তারা এই সব ধর্মঘট, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা আদৌ পছন্দ করতো না। সেই জন্যে পাভেলেব উপর তাদের বেশ রাগই ছিল। মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তারা বলতো,—কথায় কথায় লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ানো! হ্যাঁ, মজাটা এবার বুঝুক! বুড়ীমাকে এখন খাবার বিক্রী করে পেট চালাতে হচ্ছে—সাবাস্ ছেলে!

কয়েকদিন পর। মা বসে খাবার বিক্রী করছেন, হঠাৎ দেখেন কাবখানাব ভেতব থেকে দুজন পুলিস সামোলভকে ধরে নিয়ে আসছে। মার বুক ছ্যাঁৎ কবে উঠলো। পুলিশ কি তাহলে সব কিছু জানতে পেরেছে?

সামোলভকে সামনে দিয়ে নিয়ে গেল। মা পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সামোলভ সামনে দিয়ে চলে যেতেই আপনা থেকে মার মাথা নত হয়ে এলো। কেন, তা তিনি জানেন না, তার মনে হলো এইভাবে নীরবে সামোলভকে অভিবাদন করা উচিত।

কাজ সেরে বাড়ী ফিরে এসে মা চঞ্চল হয়ে পায়চারি করতে থাকেন।

এখনো আইভানোভিচ বিলি করবার জন্যে বইপত্র কিছুই দিয়ে যায়নি তাকে, তার জন্যে মা ছটফট করতে থাকেন। কাজ আরম্ভ করবার জন্যে তাঁর ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে অষ্টপ্রহর তাগিদ দিতে থাকে। তাঁর কাজের ওপর তাঁর ছেলের ভালমন্দ নির্ভর করছে তাই আর এক মুহূর্তও দেরী করতে তাঁর ভাল লাগছিল না।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে মা পায়চারী করছিলেন। বাইরে অন্ধকারে ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে! রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। চারিদিক নিশুতি! এমন সময় কে যেন দরজায় আস্তে কড়া নাড়লো। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই ঘরের ভেতর একটি মেয়ে ছুটে চলে এল। মা চেয়ে দেখতেই চিনতে পারলেন, শাশাঙ্কা!

শাশাঙ্কাকে দেখে মার শূন্য হৃদয় স্নেহে ভরে উঠলো। আদর করে শাশাঙ্কাকে বুকে টেনে নিয়ে মা বললেন,—'হ্যাঁরে, এতদিন কোথায় ছিলি মা?'

শাশাঙ্কা বলে,—'ওহঃ, আপনি জানেন না বুঝি! আমাকেও যে সেদিন জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তবে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে···

মার কানে-কানে শাশাঙ্কা বলে,—'কাগজপত্রগুলো আমিই এনেছি!'

মা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—'কই দেখি?'

শাশাঙ্কা গায়ের জামা খুলে ফেলতেই, ভেতর থেকে গাছের শুকনো পাতার মতন ছাপানো সব ইস্তাহার, কাগজ মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে।

এমন সময় বাইরে দরজার কাছে পায়ের শব্দ হলো। শাশাঙ্কার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মাকে কানে-কানে বললো,—'যদি দেখেন পুলিসের লোক···তাহলে আমার সঙ্গে অচেনা লোকের মতন ব্যবহার করবেন,··· বলবেন মেয়েটি অন্ধকারে পথ ঠিক করতে না পেরে এখানে ঢুকে পড়ে, ঘরে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে···তার কাছ থেকেই এইসব কাগজ পেয়েছি!'

মা প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন,—'তা কেন বলতে যাবো?'

এমন সময় পদশব্দ একেবারে ঘরের দরজার সামনে এসে থামে···

মা মাথা তুলে উঁকি দিয়ে দেখেন…পুলিস নয়, আইভানোভিচ…

ঘরে ঢুকেই আইভানোভিচ বলে—'মা, বড় ঠাণ্ডা, একটু গরম চা।'

তারপর শাশাঙ্কার দিকে নজর পড়তেই বলে ওঠে,—'এই যে তুমি দেখি আগেই এসে গিয়েছ, বেশ! এই যে মেয়েটিকে দেখছেন মা, খুব সাংঘাতিক! জেলে ইনস্‌পেক্টর ওকে অপমান করে…তার জন্যে এই একরত্তি মেয়ে ক্ষেপে বললো,—যতক্ষণ ইনস্‌পেকটর এসে ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ জলগ্রহণ করবো না…ব্যাস্‌…আটদিন নিরম্বু উপবাস করে রইলো মেয়ে?'

স্নেহবিগলিত দৃষ্টিতে শাশাঙ্কার দিকে চেয়ে মা বলে ওঠেন,—'আহা বাছারে! আটদিন জল পর্যন্ত না খেয়ে ছিলি? এমনি করেই একদিন তোরা মারা পড়বি।'





মা তাড়াতাড়ি চা করে এনে দেন। চা খাওয়া হয়ে গেলে আইভানোভিচ শাশাঙ্কাকে বলে,—'যাও, আর দেরী নয়, এবার বেরিয়ে পড়!'

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'ওমা এত রাত্তিরে ও একলা কোথায় যাবে?'

আইভানোভিচ বলে,—'ওকে শহরে ফিরে যেতেই হবে মা। দিনের আলোয় ওর চলাফেরা করা ঠিক নয়, পুলিশের লোকেরা দেখতে পাবে—তাই এই রাত্রির অন্ধকারেই ওকে ফিরে যেতে হবে। নাও, শাশাঙ্কা, আর দেরী করো না!'

মা শাশাঙ্কাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে তার মাথায় চুম্বন করেন। শাশাঙ্কা অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে। মা জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখেন অন্ধকারে বরফের মধ্যে একা শাশাঙ্কা পথ ধরে চলেছে। বেদনায় তাঁর মাতৃ হৃদয় উথলে উঠে।

মার মনের ভাব বুঝতে পেরে আইভানোভিচ বলে,–'জানেন মা, এইটুকু বয়সে ও কতবার জেল খেটেছে? জেলে জেলে ওর শরীর একদম ভেঙ্গে গিয়েছে। আমার মনে হয়, ওর ক্ষয়রোগ হয়েছে!'

বেদনা ভরা কণ্ঠে মা জিজ্ঞাসা করেন,—'সে কী, ওর আপনার জন

কি কেউ নেই ?

—'কেন থাকবে না ? ও মস্তবড় জমিদারের মেয়ে। সব ছেড়ে এসে আমাদের সঙ্গে মিশেছে। বিশেষ করে পাভেলকে ও বড় ভালবাসে। বোধহয় ওদের শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে !'

মা অবাক হয়ে বলেন,—কই, সে-কথা তো পাভেল কোনদিন আমাকে বলে নি ! আচ্ছা লোকত তোরা বাপু !'

এরপর আইভানোভিচ কাজের কথা শুরু করে। কিভাবে বই বিলি করতে হবে, তার সমস্ত হদিস্‌ আইভানোভিচ মাকে বুঝিয়ে দেয়। ভেবেছিল, মার বোধ হয় বুঝতে অসুবিধা হবে কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলো, মা সমস্ত ব্যাপারটাই অনায়াসে বুঝে নিলেন।

সমস্ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে আইভানোভিচ মাকে জিজ্ঞাসা করে,—'আচ্ছা মা, যদি পুলিশের লোক আপনাকে ধরে ফেলে, আর জিজ্ঞাসা করে এসব বই কোথা থেকে পেলেন, কি বলবেন আপনি ?'

মা উত্তেজিতভাবে বলেন,—'বলবো,—আমি যেখান থেকেই পাইনা, তাতে তোমাদের কি বাপু ?'

আইভানোভিচ হেসে ওঠে। মাকে বলে, —'ওকথায় তো পুলিস ভুলবে না। যতক্ষণ ঠিক উত্তর না পাবে, ততক্ষণ আপনাকে জ্বালাবে, প্রশ্ন করবে।'

—'আমি কিছুই বলবো না !'

—'আপনাকে তখন ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে রাখবে।'

—'রাখুক ! তোমরাও তো জেলে যাও। দুধের বাছারা জেলে যেতে পারে, আর আমি পারি নে ! যারা জীবনকে বুঝেছে, তাদের কাছে জেলের কষ্ট, কষ্ট বলেই হয়ত মনে হয় না। আমিও ধীরে ধীরে একটু একটু করে যে জীবনকে বুঝতে শিখছি !'

আইভানোভিচ উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে,—'এই তো চাই মা। তুমি যদি জীবনকে বুঝে থাক, তাহলে তোমাকেই যে আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন !'

পরের দিন দুপুরবেলা বুকের ভেতর জামার তলায় ছাপানো

ইস্তাহারগুলো নিয়ে মা বেরিয়ে পড়েন। মাথায় খাবারের ঝুড়ি।

কারখানার ফটকে এসে মা দেখেন, দুজন পুলিশের লোক ফটক দিয়ে যে সব মজুর ভেতরে ঢুকছে, তাদের সার্চ করে করে দেখছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মা এগিয়ে যান। বলেন,—'আমি বুড়ী মানুষ, মাথায় বোঝা নিয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি বাবা! আমাকে যদি একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও!

একজন পুলিশ খাবারের ঝুড়িটা নেড়েচেড়ে দেখে বলে,—'যা বুড়ী যা!'

কারখানার ভেতর মা যথাস্থানে গিয়ে বসেন। এমন সময় দুজন মজুর এসে মাকে জিজ্ঞাসা করে,—'কিগো বুড়ীমা, আজ মোহনভোগ এনেছ নাকি?'

আইভানোভিচ মাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, মোহনভোগ হলো সাঙ্কেতিক কথা। মা বুঝতে পারেন।

মা হেসে বলেন,—'হাঁ বাবা, আজ এনেছি। একদম টাটকা জিনিস!'

চারদিক চেয়ে যখন দেখলেন কেউ কোথাও নেই, মা জামার ভেতর থেকে কাগজের বাণ্ডিলটা বার করে তাদের হাতে দিয়ে দিলেন। তারা হাসতে হাসতে চলে যায়।

মা হাঁক্‌তে থাকেন,—'চাই, গরম আলুকপির ঝোল, টাটকা মাংসের সুরুয়া, চা—ই......!'

সেদিন খাবার বিক্রী করে কারখানা থেকে ফেরবার মুখে মার সারা মন এক অজানা আনন্দে দুলে উঠতে থাকে! তিনি ছেলে ও তার বন্ধুদের কাজের অংশীদার হতে পেরেছেন, দেশের কাজে লেগেছেন, এতে তার আর আনন্দের সীমা নেই। ঘরের ভিতরে বদ্ধ জীবন থেকে তিনি এই প্রথম বাইরের জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সংযুক্ত হলেন। তাঁর মনে শুধু একটা কথাই বড় হয়ে উঠতে থাকে, যেদিন তাঁর ছেলে এই খবর জানতে পারবে, সেদিন না সে কতখানিই খুশি হবে। আজ তাঁর খালি মনে হতে



থাকে, এতদিন পরে তিনি যেন আবার নতুন করে জন্মগ্রহণ করলেন। একটা নতুন জীবনের স্বাদে তাঁর দুঃখ ভরা পুরানো জীবনের সব গ্লানি যেন মুছে গেল।

সেদিন রাত্রিবেলা মা একলা বসে ভাবছেন, এমন সময় দরজায় পায়ের শব্দ হতে চমকে উঠলেন। দরজা খুলতেই দেখেন লিটিল রাশিয়ান।

মাকে জড়িয়ে ধরে লিটিল রাশিয়ান বলে ওঠে,—'মাগো!'

মার দুচোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

লিটিল রাশিয়ান মার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে কেঁদো না মা। তাহলে আমিও কান্না বন্ধ করতে পারবো না! তুমি শুনে সুখী হবে—পাভেলও যে শিগ্‌গির ছাড়া পাবে!

—'ওরে জানিস্ আজ আমি কি করেছি?' হ্যাণ্ডবিল বিলি করার কথা মা সবিস্তারে লিটিল রাশিয়ানকে জানান।

লিটিল রাশিয়ান আনন্দে চীৎকার করে ওঠে,—'এই তো চাই মা! তোমার এই কাজে আমাদের দলের যে কি উপকার হবে, তাত তুমি জান না মা!'

জন্ম থেকে যে অন্ধকার ঘরে আটক থেকেছে, সে যখন মুক্ত হয়ে আলোতে এসে দাঁড়ায়, তখন তার মনে যে আনন্দ জেগে ওঠে, আজ মার মনও সেই আনন্দে ভরে উঠেছে! লিটিল রাশিয়ানকে ফিরে আসতে দেখে, সেই আনন্দ শতগুণ হয়ে উঠলো। কোথা থেকে মার মনে কথার জোয়ার যেন উথলে ওঠে। মা বলতে থাকেন—

—'জানিস্ বাবা, সারা জীবন ধরে শুধু মুখ বুজে কষ্ট সয়েছি, মার খেয়েছি, আর মনে মনে ভেবেছি, আমাদের মতন এরকম জীবনে কি লাভ? কতদিন ভগবানকে মনে মনে ডেকে বলেছি, হে ভগবান, কেন আমাদের পৃথিবীতে এনেছ? এই সংসারে দুবেলা দুমুঠো খাওয়া, রান্না-বান্না করা আর ঘুমানো ছাড়া আর কিছুইত আমি জানতাম না। আজ তোদের কাছ থেকে নতুন করে জানতে পেরেছি, এই পৃথিবীকে। জানিস্ মনে হয় তোকে, পাভেলকে যেরকম ভালবাসি, ঠিক

সেরকমভাবে যেখানে যত দুঃখীজন আছে তাদেরকেও ভালবাসি—তাদেরকেও বুকে আঁকড়ে ধরে থাকি।'

কথায় কথায় রাত গভীর হয়ে আসে। আজ যেন মার কথা আর ফুরোতেই চায়না। হঠাৎ মনে পড়লো লিটিল রাশিয়ান হয়তো এখনো কিছুই খায় নি। তাড়াতাড়ি করে রান্না চাপিয়ে তার খাবারের ব্যবস্থা করেন।

•

পরের দিন যথাসময়ে কারখানার ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুজন পুলিস হেঁকে উঠলো,—'এই বুড়ী দাঁড়া!'

পুলিশ দুজন এসে মার খাবারের চুবড়ী ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলো। একজন হঠাৎ মার পিঠে হাত দিয়ে টোকা মেরে কি যেন পরখ করলো।

মা ব্যস্ত হয়ে বলেন,—'আমাকে ছেড়ে দাও বাবা! খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!'

মাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে পুলিসের একজন লোক বলে উঠলো,—'আরে না, এ বুড়ীর কাজ নয়—আমি যা বলছি তাই ঠিক··· নিশ্চয়ই পাঁচিলের ওপর দিয়ে কেউ ভেতরে ফেলে দিয়েছে।'

মা চুপটী করে সব শোনেন। পুলিস তাঁকে ছেড়ে দেয়। কারখানার ভেতরে ঢুকতেই একজন পরিচিত বুড়ো মজুর মার কাছে এসে কানে কানে বলে,—'শুনেছ নিলোভ্না, কাল আবার কারখানার ভেতরকে হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়ে দিয়েছে, তাই আজ পুলিসের জোর তদারক হচ্ছে।'

মা খাবার সাজিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসেন। চারিদিকে চেয়ে দেখেন, দুচার জন মজুর মিলে জটলা করে সেই হ্যাণ্ডবিলের কথাই আলোচনা করছে। সকলের মুখে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব।

মা হাঁকতে থাকেন,—'চাই গরম টাট্‌কা খা-বা-র, চা-ই··· ।'

মার কণ্ঠস্বর শুনে গতদিনের সেই দুজন মজুর হাসতে হাসতে মার কাছে এগিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে,—'আজ কোন নতুন খাবার আছে নাকি মা?'

মা মৃদু হেসে বলেন,—'রোজ রোজ নতুন খাবার কোথায় পাব বাছা ?'

মজুর দুটী চুপিচুপি মাকে শুনিয়ে বলে,—'দেখ্‌ছো তো, একদিনেই কিরকম হাওয়া বদলে গিয়েছে ?'

কাছে দাঁড়িয়ে অন্য দুজন মজুর কথা বলছিল।

—'আমি ভাই একটাও জোগাড় করতে পারলাম না···আর জোগাড় করেই বা কি করতাম, পড়তে তো আর জানি না।'

অপর মজুরটা বলে,—'আমি বহুকষ্টে একটা কাগজ জোগাড় করেছি। আমার ভেতরকার জামার পকেটে আছে···চল্‌ বয়লার ঘরে, ওখানে কেউ নেই, তোকে পড়ে শোনাচ্ছি।'

তাদের প্রত্যেকটি কথা মা শুনতে পান। চোখের সামনে দেখতে পান লেখার কি প্রভাব! আনন্দে নেচে ওঠে মার প্রাণ। জোরে জোরে হাঁকতে থাকেন,—'চাই গরম খা-বা-র চাই—।'

সেদিন বাড়ী ফিরে এসে মা সব ব্যাপার লিটিল রাশিয়ানকে জানালেন।

—'জানিস্‌, একজন মজুর কি দুঃখ করছিল···সে বেচারা পড়তে জানে না। তার কথা শুনে আমারও মনে হলো, আমিও তো পড়তে জানি না। সেই কবে ছেলেবেলায় একটু আধটু পড়তে শিখেছিলাম, আজ সবই ভুলে গিয়েছি।'

লিটিল রাশিয়ান বলে,—'তার জন্য দুঃখ কি মা। তুমি আবার পড়তে শেখো, আমি তোমাকে শেখাবো···এক্ষুণি···'

একটা বই টেনে নিয়ে একটা অক্ষরের ওপর আঙুল রেখে লিটিল রাশিয়ান বলে,—'বল তো মা, এই অক্ষরটা কি ?'

একটু ভাল করে দেখে নিয়ে মা বলেন—'এ।'

—'আর এটা ?'

—'আর্‌।'

হঠাৎ মার মনে মনে নিদারুণ শোক আর অভিমান জেগে ওঠে। নিজের সারাজীবনের ব্যর্থতা আজ যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। মার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,—'ওরে সারা জীবন কাটিয়ে শেষ বয়সে কি আর আরম্ভ করা যায়।'

লিটিল রাশিয়ান উৎসাহ ভরে বলে ওঠে,—'বয়সটা কিছুই নয়। তাতে কি হয়েছে মা! মানুষের কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হয় না। এক ফোঁটা বৃষ্টির জল, তাও ব্যর্থ যায় না। কোথায় কোন্ বীজ সেই এক ফোঁটা জলের অপেক্ষায় থাকে, সেকি কেউ বলতে পারে? আমি তোমাকে লিখতে পড়তে শেখাবোই। পাভেল ফিরে এসে দেখে কেমন অবাক হয়ে যাবে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন,—'পাগল ছেলে আমার!'

ইতিমধ্যে মা তিনবার জেলে পাভেলের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুলিসের অনুমতি মেলে নাই। অবশেষে একদিন বহু আকুতিমিনতির পর দেখা করার অনুমতি পেলেন।

জেলের দরজায় এসে দেখেন, তাঁর মত আরো অনেক লোক এসেছে কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। জেলের প্রহরী একে একে নাম ধরে ডাকছে, আর এক এক জন করে ভেতরে গিয়ে দেখা করে আসছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবার পর একজন মোটা পুলিস কর্মচারী এসে মাকে ডেকে জেলের ভেতর নিয়ে গেল।

একটা ছোট্ট আধ-অন্ধকার ঘরে জালের ভেতরে পাভেল কয়েদীর বেশে মার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ছেলের সেই কয়েদীর পোষাক দেখে মা প্রথমে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তারপর জালের কাছে এগিয়ে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কেমন আছিস্ পাভেল, সোনা আমার?'

পাভেল দেখে মার দুচোখে জলে ভরে এসেছে।

ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে মার হাত ধরে পাভেল বলে,—'ওরকম কোরো না মা, এই তো আমি বেশ ভালই আছি!'

এমন সময় এক প্রহরী গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মাকে আদেশ করে,—'অত কাছাকাছি দাঁড়ানো চলবে না, সরে দাঁড়িয়ে কথা বলো!'

প্রহরীর মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে মা সরে আসেন, তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে পাভেলকে জিজ্ঞাসা করেন,—'ওরে আর কতদিন তোকে জেলে রাখবে? জানিনা, কেনইবা তোকে জেলে ধরে রেখেছে। তোর অসাক্ষাতে সেইসব কাগজপত্র ঠিক তেমনিই তো কারখানায় কারখানায় বিলি হচ্ছে।'

মা কৌশলে শেষের কথাগুলোর ভেতর দিয়ে পুত্রকে জানিয়ে দেন, তার অসমাপ্ত কাজ মা নিজেই তুলে নিয়েছেন।

মার কথার ইঙ্গিত পাভেল বুঝতে পারে। তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞাসা করে,—'তাই নাকি? সত্যি মা?'

প্রহরী গর্জন করে ওঠে,—'ওসব কথা, এখানে আলোচনা করা চলবে না! ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা এখানে হবে না।'

পাভেল রুক্ষকণ্ঠে প্রহরীকে জানায়,—'বেশ, তাই হবে!'

তারপর মার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'তুমি সারাদিন কি করো মা?'

মা উৎসাহভরে বলে ফেলেন,—'আমি! আমি এই সব কারখানায় নিয়ে যাই, মানে—মাংস, জলখাবার এই সব···মেরিয়ানার হয়ে আমি কাজ করছি বুঝলি?'

পাভেল মার কথার ইঙ্গিত সমস্তই বুঝতে পারলো। তার ভীরু মা যে আজ এত বড় কাজ করতে এগিয়ে এসেছে, সেই গর্বে পাভেলের বুক ভরে ওঠে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে গর্ব সে দেখাতে পারে না। তাই আনন্দে গদগদকণ্ঠে বলে,—'আমার সোনা মা-মণি! যাক্ এখন তো একটা কাজ পেয়েছ···তেমন একলা একলা তো আর মনে হয় না?'

প্রহরী বলে উঠলো,—'সময় হয়ে গিয়েছে!'

বিদায় নিতে গিয়ে মার দুচোখ ফেটে আবার জলের ধারা ঝরে পড়ে। পুত্রের দিকে চাইতে চাইতে মা ফিরে আসেন।

তিনচার দিন পরে একদিন রাত্রি বেলায় মা আর লিটিল রাশিয়ান ঘরে বসে গল্প করছেন,···এমন সময় ঝড়ের মতন ঘরে ছুটে এসে ঢুকলো, নিকোলে!



—'এই মাত্তর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, সোজা এখানে ছুটে আসছি।'

মা আদর করে বলেন,—'বেশ করেছ বাবা! তবে তোমার একবার বাড়ী যাওয়াও তো দরকার!'

মার কথায় নিকোলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে,—'বাড়ী! আমার কি বাড়ী আছে? একখানা খালি ঘর পড়ে আছে···আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মেঝেতে না খেতে পেয়ে ঠাণ্ডায় আরশুলাগুলো শাদা হয়ে মরে পড়ে আছে, ইঁদুরগুলো হয়তো না খেতে পেয়ে মরে পচে আছে·· সমস্ত ঘর সেই পচা দুর্গন্ধে ভরা···সে কি আর ঘর? কি সুখে যাব সেখানে? আজ রাত্তিরের মত মা এখানে কি একটু থাকতে দেবে?'

মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন,—'একি আর জিজ্ঞেস করতে হবে বাবা? এতো তোমাদেরই বাড়ী!'

মার স্নেহে নিকোলের মনের গভীরে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে গভীর বেদনা জেগে ওঠে। সে বেদনা সে আর চেপে রাখতে পারে না। আস্তে আস্তে বলে,—'মা, আমাদের অধিকাংশ লোকের এমনি ভাগ্য যে মা-বাপের পরিচয় দিতে পর্যন্ত লজ্জা করে। আপনার মতন মা কোন্ ছেলে পায়? আমার মার কথাতো মনেই নেই,...বাপকে...জানি... চোর...সমাজে আমার পরিচয়, আমি চোরের ছেলে! তাই ঠিক করেছি আর বাড়ীতে ফিরবো না। আমি জানবো, আমার বাপ নেই, কেউ নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই, পৃথিবীতে আমি একা। তাই মাঝে মাঝে দুরন্ত সাধ যায়, সাইবেরিয়ায় চলে যাই। যাবো সাইবেরিয়াতে— তবে তার আগে দু'একটা কাজ করে যেতে হবে।'

লিটিল রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করে,—'কি কাজ?'

নিকোলে গম্ভীরকণ্ঠে বলে,—'কতকগুলো লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা!'

লিটিল রাশিয়ান হেসে ওঠে,—'সেকি, তাতেই কি সব দুঃখ কষ্ট মিটে যাবে?'

নিকোলে বলে ওঠে,—'তোমার কোন যুক্তিই আমি আর শুনতে চাই না—তুমি তো জান না, আমার মনের ভেতর কি নিদারুণ ঘৃণা আর আক্রোশ জমা হয়ে উঠেছে। যারা আমার জীবনকে এমন নিরাশায় ভরে দিয়েছে...তাদের আমি...'

লিটিল রাশিয়ান বাধা দিয়ে বলে,—'ভাই, আজ তোমার মনে যে ব্যথা বেদনা হচ্ছে, মনে করো না তা আমি বুঝি না। আমিও একদিন এই ব্যথা আর এই নিরাশার মধ্যে নানারকমের পাগলামির কথা ভাবতাম। ছোট ছেলেদের হাম হয়, জানতো? তেমনি আমাদের মতন যারা তরুণ, যারা কিছু করতে চায়, তাদেরও এক রকম মনের রোগ হয়। তখন মনে হয় পৃথিবীতে কেউই বোধ হয় আমাকে বুঝলো না, পৃথিবীর কাছ থেকে আমার যা প্রাপ্য তার কিছুই পেলাম না, আমার চেয়ে পৃথিবীতে আর বুঝি কেউ দুঃখী নেই।

তারপর জীবনের সঙ্গে যখন আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হবে, যখন

জীবনকে আরো গভীরভাবে দেখতে শিখবে, তখন বুঝবে, তোমার বুকে যে ব্যথা বাজে, আর সবারও বুকে সেই একই রকম ব্যথা বাজতে পারে···যে দুঃখে তুমি কাঁদছো সে তোমার একার দুঃখ নয়, সেই দুঃখে তোমার সঙ্গে আরও হাজার হাজার লোক কাঁদছে· তখন আর নিজের দুঃখকে বড় করে দেখতে আপনিই লজ্জা পাবে। আজ হয়ত তোমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার ছোট্ট বাঁশীতে যে-সুর বাজছে সে-সুর যেন সকলকে ছাপিয়ে ওঠে। কিন্তু এমন একদিন আসবে তখন তুমি তোমার এই ছোট্ট বাঁশীর সুরটুকুকে জগতের বিরাট সুরের ঐক্যতানের মধ্যে এক করে মিশিয়ে দিতে চাইবে জগতের বিরাট ঐক্যতানের সুবিশাল সুরের মধ্যে তোমার ছোট্ট বাঁশীর সুরটাও যে মিশে আছে, সেই আনন্দ তখন তোমার মন ভরে উঠবে! তখন তুমি বুঝতে পারবে, সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেব'র যে কি বিরাট আনন্দ!'

এমন সময় মা রান্নাঘর থেকে কিছু খাবার আর গরম চা নিয়ে আসতে দুজনার কথা থেমে গেল।

হঠাৎ আয়নার সামনে গিয়ে নিকোলে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—'উঃ, কতদিন হলো আয়নাতে মুখ দেখি নি···কিন্তু···কি কুৎসিত



আমার মুখ।'

লিট্‌ল রাশিয়ান প্রতিবাদ করে উঠলো,—'আরে তাতে কি যায় আসে?'

নিকোলে জবাব দিলো—'কেন, শাশাঙ্কা যে একদিন বলেছিল, মুখই হলো মনের আয়না।'

লিট্‌ল রাশিয়ান বলে—'সে-কথা হয়ত সত্যি, কিন্তু তার সঙ্গে মুখের গড়নের কোন যোগ নেই। শাশাঙ্কারত নাক চ্যাপ্‌টা, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে কিন্তু তবুও তার মন ঐ আকাশের নক্ষত্রের মতন সুন্দর।'

লিট্‌ল রাশিয়ানের কথায় নিকোলের ব্যথিত মন যেন খানিকটা সান্ত্বনা পায়। নীরবে দুজনে চা পান করে।

সেদিন রাত্রিতে শোবার সময় লিট্‌ল রাশিয়ান বিছানায় শুয়ে নীরবে ভাবছে। হঠাৎ তার কানে এলো পাশের রান্নাঘরে মা বিছানায় শুয়ে প্রার্থনা করছেন,—হে প্রভু, এ জগতে যত লোক আছে, সবাই দেখি কাঁদে, আর প্রত্যেকেরই কান্নার সুর আলাদা। কবে তোমার পৃথিবীতে এমনি ধারা সকল লোকই আনন্দের সুর তুলবে?

লিট্‌ল রাশিয়ান বিছানা থেকে মাকে বলে,—'মাগো, সে সময় আসতে আর দেরী নেই···আমি শুনতে পাচ্ছি তার আগমনীর সুর।'

ক্রমশ রাত্রির অন্ধকারে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

মার ঘরের আড্ডা ধীরে ধীরে আবার জমে ওঠে। প্রায়ই নতুন নতুন সব লোক আসে। মা নীরবে তাদের কথাবার্তা আলোচনা শোনেন। তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে শুনতে মা এতদিন যা জানতেন না, বুঝতেন না, সেই বাইরের বিরাট বিশ্বের নানা কথা জানতে পারেন, বুঝতে পারেন।

লিট্‌ল রাশিয়ান তাদের নিয়ে আলোচনায় বসতো। রোজই খবরের কাগজ পড়ে সবাইকে সে শোনাতো। কোথায় কোন্ শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, কোথায় কোন দেশের লোক দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তাদের সমবেদনায় সেই ছোট্ট ঘরটী ভরে উঠতো।

একদিন খবরের কাগজে কারখানার কুলীমজুরদের ওপর জারের পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা পড়ে তারা সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। একজন জিজ্ঞাসা করে উঠলো,—'বলতে পার, এ সব কার দোষ ?'

কে একজন উত্তর দেয়—'দোষ আবার কার ? জারের !'

লিটিল রাশিয়ান স্লাম হেসে বলে,—'আসল দোষ হলো কার জান ভাই, যে লোকটা জগতে প্রথম বলেছিল, এটা আমার সম্পত্তি, এটা আমার একলার জমি···সেই করেছিল আসল অপরাধ। কিন্তু সে লোকটাত শত শত বছর আগে মরে গিয়েছে--আর তারই ভূত যেন চারদিকে এই অনাচার করে চলেছে।'

নিকোলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে বসে থাকতে পারে না। পাগলের মতন ঘরে পায়চারী করতে থাকে। তার সেই উত্তেজিত মুখের চেহারা দেখলেই মনে হয়, অষ্টপ্রহর কে যেন তাকে ভেতর থেকে গলা টিপে ধরছে।

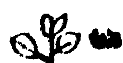
আলোচনার মাঝখানে উত্তেজিত হয় সে বলে উঠলো,—'শক্ত মাটিতে ভাল ফসল ফলাতে হলে কি করতে হয় জানোতো ? সর্বপ্রথমে একহাত করে মাটি কুপিয়ে ফেলে দিতে হয় ! তেমনি এই পৃথিবীকেও যদি ভাল করতে হয়, তবে আগে তার ওপর থেকে একহাত করে মাটি ধারালো কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ফেলে দিতে হবে ! নইলে এ মাটিতে কোন ভাল ফসলই ফলবে না !'

নিকোলের কথার মানে মা বুঝতে পারেন···বলেন,—'ওরে তোরা যেমন বলছিস্ ওদের সম্বন্ধে, ওরাও ঠিক তেমনি তোদের সম্বন্ধে বলে··· এমনি ঘৃণায় তোদেরও উপড়ে ফেলে দিতে চায়···সেদিন গরমভ্ ঠিক এই রকম কথাই তো বলছিল।'

গরমভের কথা উঠতেই নিকোলে চীৎকার করে উঠলো,—'কার কথা বলছো মা ?'

—'গরমভ্।'

গরমভের নাম শুনেই নিকোলে একেবারে ক্ষেপে ওঠে।



'গরমভ লোকটা হলো স্পাই। সেই গ্রামের লোকদের ভেতর থেকে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে পুলিসকে দেয়। বেটার বদমায়েসী আজকাল সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে'—নিকোলে গজরাতে থাকে।

মা সে কথায় সায় দিয়ে সরলভাবেই বলে উঠলেন,—'হ্যাঁ বাবা, আজকাল দেখি, প্রায়ই সে আমাদের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে...'

সেকথা শুনে নিকোলে বলে ওঠে,—'ও তাই নাকি!'

আপনার মনে সে যেন কি ভাবতে থাকে, তারপর হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

নিকোলে চলে গেলে মা বলেন,—'ওকে দেখলে আমার কেমন যেন ভয় করে...ওকে দেখলে যেন একটা জ্বলন্ত উনুনের মত মনে হয়...যা সামনে পাবে তাই যেন পুড়িয়ে ফেলবে।'

গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে মাকে ডেকে লিটিল রাশিয়ান বলে,—'ওর সামনে গরমভের কথা আলোচনা করাটা ঠিক হলো না!'

সেদিন কারখানার ছুটি ছিল। বিকেল বেলা কি একটা কাজে মা বাইরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর যখন বাড়ী ফিরে এলেন, দরজায় ঢুকতেই তাঁর কানে একটা অতিপরিচিত স্বর ভেসে এলো...পাভেলের কণ্ঠস্বর?

ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে পাভেলকে দেখেই মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন...

—'উঃ, এতদিন পরে ছুটি পেলি তাহলে?'

মাতৃ গর্বে উদ্বেল-বুক পাভেল বলে ওঠে,—'মা, সোনা আমার!'

মা আর ছেলের যেন আজ নতুন করে পরিচয় হলো। যে মাকে বাড়ী রেখে পাভেল জেলে গিয়েছিল, ফিরে এলো সে যেন আরেক মায়ের কাছে, যে মা শুধু তারই মা নয়, সকলের মা!

সেই কথাকে বোঝাবার জন্যে মা নিজের মতন করে বলে ওঠেন,—'আমি তো তোকে জন্ম দিই নি...তুই-ই আমাকে নতুন জন্ম দিয়েছিস্।

আমি আর তোর জন্যে কি করতে পেরেছি বল্!'

পাভেল বলে,—'তুমি যে কতখানি করেছ, তা তুমি জাননা মা। তুমি যে আজ আমাদের এই সাধনায়, আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তোমাকে কি বলবো মা,—আমার আজ যে কি আনন্দ হচ্ছে! তুমি আমাকে জগতে এনেছ, জগতে চলার পথে সেই তুমিই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছো, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছো, তোমার ছেলে হয়ে এর চেয়ে বড় গর্ব করবার, আমার আর কিছু নেই মা!'

আনন্দে মার কথা বন্ধ হয়ে আসে। দুচোখ ফেটে জল ঝরে পড়ে, কিন্তু আজ সে দুঃখের অশ্রুজল নয়, আনন্দের বন্যা। আদরে লিটিল রাশিয়ানকে জড়িয়ে ধরে মা বলেন,—'জানিস, পাভেল এই দুষ্টু ছেলেটা এর মধ্যে আমাকে কথায় কথায় কত জিনিস শিখিয়েছে?'

বন্ধুর দিকে গর্বভরে চেয়ে পাভেল বলে,—'আমি এরি মধ্যে ওর মুখে সব শুনেছি মা!'

মা বলেন,—'জানিস খোকা, ও এই বুড়ো বয়সে আমাকে বলে কিনা পড়তে!'

পাভেল হেসে বলে,—'ওঃ, তাই বুঝি তুমি লজ্জায় লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে শুরু করলে?'

—'ওমা, লুকিয়ে আর পড়তে পারলাম কোথায়? একদিন এই দুষ্টু ছেলেটা হাতেনাতে ধরে ফেল্লে!'

আনন্দে সকলে হেসে উঠলো।

ক্রমশ বরফ গলতে শুরু করে। বাতাসে উষ্ণতার আমেজ, আকাশে দেখা দেয় বসন্তের আলো। গাছে নতুন পাতা বেরোতে শুরু করে।

পাভেলের ঘরে সন্ধ্যাবেলা একে একে কারখানা থেকে ফিরে এসে সব বন্ধুরাই হাজির হয়। চলে নানাবিষয়ে আলোচনা।

সামনেই মে মাস। শ্রমিকদের জাগরণ উপলক্ষে পাভেলদের দল ১লা মে প্রকাশ্যে করবে মে-উৎসব। চলে তার আলোচনা, আয়োজন।

মা কান পেতে তাদের কথাবার্তা আলোচনা শোনেন। যে উৎসব! সেটা আবার কি রকম? যদি সে উৎসবই হয়, তবে এরা এতো মুখ ভার করে থাকে কি ভাবে?

মা রান্নাঘরে কাজ করছেন, এমন সময় তাঁর কানে এলো, শাশাঙ্কা আর পাভেল একা ঘরে কথা বলছে! মা কান-খাড়া করে শোনেন, শাশাঙ্কা জিজ্ঞাসা করছে,—'তাহলে নিশানটা কি তোমার হাতেই থাকবে?'

পাভেল গম্ভীরভাবে বলে,—'নিশ্চয়ই!'

—'একি একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে?'

—'নিশ্চয়ই, এ আমার অধিকার।'

—'এই ত সেদিন এলে জেল থেকে, আবার যাবে জেলে।'

—'সে-কথা আর এখন ভাববার প্রয়োজন নেই···স্থির হয়ে গিয়েছে আমার হাতেই থাকবে রক্ত পতাকা···।'

তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মা বুঝতে পারেন, যে উৎসব নিয়ে কেন এত ভাবনা, এত দুশ্চিন্তা! ভয়ে তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। তিনি তাড়াতাড়ী রান্নাঘরে সামোভারে জল চাপিয়ে চা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

লিটিল রাশিয়ান আর পাভেল তখন আলাপ করছিল, মা ঘরে ঢুকে পাভেলকে জিজ্ঞাসা করেন,—'হ্যাঁরে, আবার তুই কি করতে চলেছিস্?'

পাভেল জিজ্ঞাসা করে,—'তুমি কি বলছো?'

মা শুধু বলেন,—'পয়লা মে··· ।'

—'ও তুমি শুনেছ বুঝি? ও কিছুনা···আমাদের দলের লোকদের নিয়ে একটা শোভাযাত্রা বেরুবে, সেই শোভাযাত্রার সামনে আমি পতাকা নিয়ে অগ্রসর হবো এবং আমার হাতে পতাকা থাকবে বলে, পুলিশ হয়ত আমাকে গ্রেফতার করতে পারে!'

পাভেল এমনভাবে ব্যাপারটা বল্লো যেন কিছুই না। মা কিন্তু কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

শান্তকণ্ঠে পাভেল বলে,—'তোমার আর এ-রকম কাতর হওয়া উচিত নয় মা, তোমার উচিত আনন্দ করা! কবে ছেলেরা এমন মা

পাবে, যাঁরা হাসতে হাসতে ছেলেদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না ?'

মা নিজেকে সংযত করে নেন, বলেন,—'না বাবা তোমাকে আর আমি কোন বাধাই দিচ্ছি না···তবে কি করবো, পোড়াচোখে যে আপনা থেকে জল এসে পড়ে ! হায়রে মায়ের মন !'

পাছে তাঁর দুর্বলতা দেখে পাভেল অসন্তুষ্ট হয়···মা তাড়াতাড়ী চা আনবার জন্যে রান্নাঘরে চলে যান।

মা চলে গেলে লিটিল রাশিয়ান পাভেলকে ধমকে উঠলো,—'মাকে অকারণ আঘাত দেওয়ার মধ্যে খুব বাহাদুরী আছে, না ! মা কি বলতে চাইছিলেন, তা কি তুমি বুঝেছ ?'

পাভেল নিজের রুক্ষতায় লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মার কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে,—'কিছু মনে করোনা মা ! আমি তোমার সেই ছোট্ট পাভেল ? তুমি কষ্ট পাওনি তো !'

আদরে পাভেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা বলেন,—'আমাকে আর কিছু তোকে বলতে হবে না। আমি সব বুঝি এখন। জানি, আজ তোরা যে পথে চলেছিস, সেখানে তোদের ওপর মায়েদের আর কোন দাবিই নেই···কিন্তু তোরা কি করে বুঝবি মায়ের বুকের কি জ্বালা। কোন যুক্তি সেখানে নেই। তোদের দেখলেই কান্নায় আমার বুক ভরে যায়, ছেলে যে মায়ের রক্ত-মাংস ! ছেলের জন্যে যদি মা না কাঁদবে, তবে তার জন্যে কে কাঁদবে আর ? আজ তোরা এই যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছিস, জানি কাল হয়ত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি···হয়ত আবার তোদের মতন নতুন নতুন সব ছেলে আসবে···তারাও হয়ত এমনি করে যাবে ··অমনি করে দলের পর দল তোরা সামনে এগিয়ে চলবি পেছনের সব কিছু ফেলে···আমার তো মনে হয় এর চেয়ে পবিত্র শোভাযাত্রা জগতে আর কিছুই নেই !'

পরের দিন সকাল বেলা বাড়ীতে মা একা রয়েছেন, এমন সময় বুড়ী মেরিয়ানা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলে,—'শুনেছ পাভেলের মা ?'

মা অজানা আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করেন,—'কি ভাই ?'

মেরিয়ানা বলে,—'গরমভকে কাল রাত্তিরে কে যেন খুন করে ফেলেছে।'

মেরিয়ানার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মার মনে আপনা থেকেই নিকোলের মূর্তি ভেসে উঠলো, মনে পড়লো গরমভ সম্বন্ধে নিকোলের রাগ।

মা জিজ্ঞাসা করেন,—'কে করলো এমন কাজ ?'

মেরিয়ানা ঝঙ্কার দিয়ে বলে,—'যে খুন করেছে সে কি আর মড়া আগলে বসে আছে, যে তার নাম জানবো ? সে তো খুন করেই পালিয়েছে ! মরবো আমরা এখন পুলিশের উৎপাতে ! বিশেষ করে তোমার বাড়ীর ছেলেরা··· ।'

মা আতঙ্কিত হয়ে বলে ওঠেন,—'না, না, তারা একাজ করবে কেন ?'

মেরিয়ানা বলে,—'তা ভাই আমার দোষ নিওনা, লোকে বলাবলি করছে তোমার ছেলের দলেরই কেউ করেছে একাজ !'

মেরিয়ানাকে বিদায় দিয়ে মা কাতর ভাবে পাভেল আর লিটিল রাশিয়ানের অপেক্ষায় পায়চারি করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই তারা দুজনে ফিরে এলো, গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ তাদের।

মা চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেন,—'হ্যাঁরে, নিকোলে কোথায় ?'

পাভেল জবাব দেয়,—'নদী পার হয়ে সে উধাও হয়ে গিয়েছে ! কিন্তু এভাবে খুন করার কোন মানেই হয় না, অন্যায়—খুব অন্যায়।'

গম্ভীরভাবে লিটিল রাশিয়ান বলে,—'অন্যায় হতে পারে কিন্তু নিরুপায় ··এই হলো জীবন ধারা—একটা অন্যায় আরেকটা অন্যায়কে টেনে আনে। তুমি বলছো অন্যায়, কিন্তু কে এ অন্যায়ে তাকে প্রণোদিত করলো ? ঐ যারা কারাগার তৈরী করেছে, ঐ যারা মানুষের সহজ মনকে পিষে মারবার জন্য সৈন্য আর পুলিশকে লেলিয়ে দেয়। এর মধ্যে যে সব চেয়ে বেশী এগিয়ে আসে আমাকে পিষে মারবার জন্যে, সেই তো অধিকার দিয়েছে আমাকেও তার বিরুদ্ধে হাত তুলতে ! এই হলো জীবনের ধর্ম।'

পাগলের মত লিটিল রাশিয়ান ঘরের একোণ থেকে ওকোণ

অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়ায়, আপনার মনে যেন কার সঙ্গে ঝগড়া, বাদ প্রতিবাদ করে চলে। যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে সে লড়াই করছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর সে পাভেলের কাঁধে হাত দিয়ে বলে,—'জানি, হত্যা, ঘৃণা, অতি কুৎসিত···জানি, এই পৃথিবীতে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে লজ্জিত হবে···যেদিন মানুষকে দেখলে মানুষ আনন্দে দুলে উঠবে। সেই মহাদিনের জন্যে আমার এমন কিছু নেই, যা আমি এখনই আনন্দের সাথে বিসর্জ্জন দিতে না পারি! যদি প্রয়োজন হয়, আমার নিজের হৃদয়ও উপরে ফেলে আমি নিজেই মাড়িয়ে যাব তাকে।'

মা দেখেন,—'লিটিল রাশিয়ানের দু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।'

পাভেল কোনদিন লিটিল রাশিয়ানকে এত অভিভূত হতে দেখেনি। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'কি হলো তোমার আন্দ্রি?'

পাভেলের চোখের দিকে চেয়ে স্থিরকণ্ঠে লিটিল রাশিয়ান বলে, —'পাভেল আমি—আমিই গরমভকে খুন করেছি!'

সমস্ত ঘর এক নিমেষের মধ্যে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায়! কারুর মুখে কোন কথা সরে না।

মা কাঁপতে কাঁপতে লিটিল রাশিয়ানের হাত দুটী ধরে বলে ওঠেন, —'ওরে, এ তুই কি করলি রে?'

স্থির কণ্ঠে লিটিল রাশিয়ান বলে,—'মা আমি যা করেছি, তা আমি নিজে গিয়েই পুলিশের কাছে বলবো, বলবো কেমন করে এবং কেন এই কাজ করলাম···'

পাভেল স্থির-দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে। সেই স্থির-দৃষ্টির মানে বুঝতে পেরে লিটিল রাশিয়ান বলে,—'তুমিত জান বন্ধু, আমি নিজে এই জাতীয় খুনকে কত ঘৃণা করি, তবুও কে যেন আমাকে এই কাজ করতে বাধ্য করলো। তুমি এগিয়ে চলে গেলে, আমি আইভানের সঙ্গে গল্প করতে করতে কারখানার দিকে যাচ্ছিলাম··· হঠাৎ দেখি এক পথের বাঁকে গরমভ্ আমাদের পিছু নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে আইভানও বাড়ী চলে গেল। আমি একা কারখানার দিকে চলেছি, তখনো দেখি গরমভ আমার পিছু নিয়ে চলেছে। ক্রমশ কাছে এসে হেসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে সুরু করে দিলো। তার কাণ্ড দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। তারপর রীতিমত আমাকে শাসাতে শুরু করলো।'

—'হে, হে পুলিশও সবই জানতে পেরেছে, এখনও আপনাদের অনেক খাটুনী হচ্ছে, পয়লা মে-র আগেই হুজুরেরা যথাস্থানে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারবেন!'

এইভাবে আমাকে সে ক্রমাগত উত্যক্ত করে চল্লো। আমি একটিও কথা বলি নি। কিন্তু তার সাহস ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগলো। শেষকালে পাজীটা আমাকে খোসামোদ করতে করতে কি বল্লে জান? আমার উচিত তাদের দলে যোগদান করে গোয়েন্দাগিরি করা, প্রচুর টাকা পয়সা পাওয়া যাবে, আরামে জীবন কাটবে। বুঝলে মনে হলো কে যেন আমার মুখে সজোরে তাল তাল কাদা ছুড়ে মারলো···আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। সোজা তার মুখের ওপর সজোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে চলে এলাম···আর ফিরেও তাকালাম না। শব্দ শুনে পেছন ফিরতে,মনে হলো সে যেন পড়ে গেল, তার কিছুক্ষণ পর থেকেই শুনছি লোকে বলাবলি করছে, গরমভকে কে খুন করেছে···তাকে খুন করবার জন্যে আমি তাকে মারি নি! তার মতন অপদার্থ একটা নোংরা লোককে খুন করার মতন নিরর্থক লজ্জাকর কাজ আর কিছুই হতে পারে না। যদি কোন নিরপরাধ লোক এর জন্যে ধরা পড়ে, তাহলে আমি নিজে গিয়ে ধরা দেবো, নইলে এ-লজ্জার কথা আর মুখেই আনবো না!'

মুখ ভার করে লিটিল রাশিয়ান বাইরে চলে যায়···

—'বাইরের হাওয়ায় একটু ঘুরে আসি।'

সমস্ত কাজ ফেলে চলে মে-দিবসের উৎসবের আয়োজন। যতই দিন এগিয়ে আসতে থাকে, ততই মার বুক কাঁপতে থাকে। নিয়ত নীরবে প্রার্থনা করেন—হে ভগবান, তুমি এদের রক্ষা কর।



রাত্রিবেলা পোষ্টার মারবার জন্যে মা আঠা তৈরী করে দেন। দেখেন নতুন নতুন সব লোক আসছে। লুকিয়ে লুকিয়ে তারা পোষ্টার নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে রাস্তার ধারে, গাছের গায়ে, কারখানার দেয়ালে লোকের বাড়ীর পাঁচিলে মেরে আসে। এমন কি পুলিশ ষ্টেশনের সামনেও কে যেন এই পোষ্টার মেরে এসেছে! সারা শহরময় হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। পুলিশ পোষ্টার ছিড়ে ফেলে, আবার তার জায়গায় নতুন পোষ্টার দেখা দেয়। পোষ্টারে প্রত্যেক শ্রমিককে, প্রত্যেক নাগরিককে মে-দিবসের উৎসবে যোগদান করবার জন্যে আবেদন করা হয়েছে! চারদিকে ছাপানো আবেদনও ছড়ানো হয়েছে। সেই সব আবেদনে শ্রমিকদের অনুরোধ করা হয়েছে, ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, মালিকদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, গরমভের হত্যার ব্যাপার নিয়ে পুলিশ এখন ও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করে নি, তাদের এই চুপ করে থাকার কি মতলব—তা পাভেলরা বুঝতে পারে না।

এই ভাবে অবশেষে রাত্রি-শেষে এসে উপস্থিত হলো পয়লা মে-র প্রভাত। প্রতিদিন ভোর না হতেই যেমন কারখানায় বাঁশী বেজে ওঠে, এদিনও শ্রমিকদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে তীব্র স্বরে কারখানার বাঁশী বেজে উঠলো।

ভয়ে আর ভাবনায় সারারাত মা একবারও চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। ভোর হতেই তিনি তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন ধরিয়ে সামোভারে জল:চাপালেন।

পাভেল আর লিটিল রাশিয়ান মুক্ত জানলা দিয়ে পয়লা মে-র সূর্যোদয়ের দিকে নীরবে চেয়ে থাকে। কে জানে আজকের দিনের বুকে কি আছে? কোন্ আশা কোন আনন্দের খবর নিয়ে উঠেছে আজকের সূর্য?

মা জল গরম করে দেন। লিটিল রাশিয়ান যখন মুখ ধুচ্ছিল, তাকে একলা দেখে মা তার কানের কাছে এসে বলেন,—'ওরে আমার একটা কথা আজ তোকে রাখতেই হবে, আজ তুই সব সময় পাভেলের সঙ্গে

সঙ্গে থাকবিত !'

লিটিল রাশিয়ান হেসে বলে,—'শুধু আজ বলে নয়, তুমি জেনে রেখো মা, আমি চিরদিনই চেষ্টা করবো ও-র সব চেয়ে কাছে কাছে থাকতে !'

পাভেল তখন আপনার মনে ঘরে পায়চারি করতে করতে গুন গুন করে গান গাইছিল, যে-গান আজ রাজপথে হাজার হাজার শ্রমিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে,···জাগো, জাগো হে নিপীড়িত মানব !

আজ সকালের সূর্যের আলো তার মনকে যেন নতুন করে রাঙিয়ে তুলছে, জগতের সমস্ত বঞ্চিত সর্বহারাদের বেদনায়।

মা চা দিয়ে যান। দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে ধীরে ধীরে চা পান করে, কিন্তু কারুর মুখেই কোন কথা নেই। দুজনেরই মন চলে গিয়েছে বহুদূরে···

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর লিটিল রাশিয়ান আপনার মনেই বলে উঠলো,—তখন আমার বছর দশেক বয়স, ছোট্ট ছেলে, কিছুই জানি না···হঠাৎ ইচ্ছা হলো কাঁচের গেলাসে রোদ ভরে রাখবো। দেয়ালের ওপর তখন রোদ এসে পড়েছে দেখে একটা কাঁচের গেলাস নিয়ে আস্তে আস্তে দেয়ালের কাছে গিয়ে সজোরে গেলাসটা দেয়ালে চেপে বসাতেই, আর যায় কোথা, গেলাসত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কাঁচে হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রহার ! বড় রাগ হলো আমার সূর্যের ওপর। মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বেরিয়ে এলাম, দেখি একটা ডোবার জলে সূর্যের কিরণ ঝিকমিক করছে। তাই না দেখে প্রাণের আনন্দে সেই ঝিকমিকে জলের ওপর লাথির পর লাথি মারতে লাগলাম, কাদায় জামা কাপড় ভরে গেল ··সুতরাং বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আর এক দফা প্রহার। তখন আর কি করি ? মুখ ভার করে জানালার কাছে চুপটি করে বসে রইলাম। আকাশে সূর্যের দিকে বুড়ো আঙুল তুলে মুখ ভেংচে বলে উঠলাম, এই আমার কচুটি···আমার তো ব্যথাই লাগে নি। দুবার বেশ ভাল করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচালাম,

তারপর যেন মনে একটু শান্তি এলো।'

মা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। কেন যে লিটিল রাশিয়ান হঠাৎ তার ছেলেবেলাকার সূর্যের ওপর এই রাগের কথা বল্লো, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

এমন সময় পাভেল বলে উঠলো—'চল এখনই বেরিয়ে পড়ি।'

লিটিল রাশিয়ান বাধা দিয়ে বলে,—'এত ব্যস্ত কেন? এত সকাল সকাল পুলিশের চোখের সামনে ঘুরে বেড়িয়ে কি লাভ?'

এমন সময় ফিদিয়া বলে তাদের দলের একজন শ্রমিক ছুটতে ছুটতে এসে বল্লো তারা সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে! দলে দলে লোক কারখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে। আর দেরী নয়, এখনই তোমরা চলো···

পাভেল আর লিটিল রাশিয়ান যাবার জন্যে পা বাড়াতেই মা এর ডাক ওদের কানে এলো; ফিরে দেখে মা তাড়াতাড়ি পোষাক বদলাচ্ছেন।

পাভেল জিজ্ঞাসা করে,—'একি! তুমি পোষাক বদলাচ্ছো কেন? কোথায় যাবে তুমি?'

মা শান্তকণ্ঠে বলেন,—'কেন, তোদের সঙ্গে যাব।'

পাভেল একমুহূর্ত কি যেন ভেবে নেয়, তারপর বলে,—'বেশ, চলো। কিন্তু একটা কথা মা, সেখানে যাই ঘটুক না কেন, তুমি কিন্তু আমাকে কোন কথা বলবে না, আর আমিও তোমাকে কোন কথা বলবো না!'

—'বেশ রে, তাই হবে।'

মা ওদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

পথ যতই এগিয়ে চলে, ততই মার কানে সাগর গর্জনের মত একটা আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। চারদিক থেকে লোক চলেছে সামনের দিকে, এগিয়ে যেতে যেতে সবাই পাভেল আর লিটিল রাশিয়ানকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। মার কানে আসে, কারা যেন বলাবলি করছে, —এই দুজনেই তো আসল নেতা।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মা দেখেন সামনে বিশাল জমায়েত। প্রতিমূহূর্তে চারদিক থেকে লোক এসে সেই জনতার জমায়েতকে বাড়িয়ে তুলছে। জনতার মাঝখানে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে নিকোলে তখন বক্তৃতা করছে :

···ফল থেকে যেমন রস নিঙড়ে ছিবড়ে ফেলে দেয় তেমনি ওরা আমাদের জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ নিঙড়ে বার করে নিচ্ছে। তারপর ছিবড়ের মতন নর্দমায় পড়ে থাকছে আমাদের জীবন।

জনতার ভেতর থেকে একসঙ্গে বহুকণ্ঠে বলে ওঠে—ঠিক বলেছ ভাই···ঠিক বলেছ!

মাকে সঙ্গে নিয়ে পাভেল আর লিটিল রাশিয়ান ভীড় ঠেলে নিকোলের দিকে এগিয়ে যায়। লিটিল রাশিয়ান চোখের ইঙ্গিতে নিকোলেকে থামতে বলে। নিকোলে থামলে লিটিল রাশিয়ান সেই টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে :

···সাথী, শ্রমিক ভাইরা···ওরা আমাদের শিখিয়েছে জগতে নানান দেশে আছে নানান জাতি, ইংরেজ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান··· আলাদা আলাদা সব জাতি। সে কথা ভুল···সারা জগতে আছে দুটো মাত্র জাতি···একজাতের নাম হলো ধনী, আর এক জাতের নাম হলো গরিব। জগতে বিভিন্ন দেশে যত সব ধনী আছে, তারা সবাই এক রকমের···তাদের ধর্ম এক, ব্যবহার এক, আচরণ এক, উদ্দেশ্য এক,··· তারা প্রত্যেকেই তাদের দেশের যারা গরিব জাতের, তাদের সঙ্গে একই রকম বঞ্চনা করে, একই রকম নিপীড়ণ আর শোষণ করে। ধনী ইংরেজ, ইংরেজ বলে দরিদ্র ইংরেজকে ভালোবাসে না, ধনী জার্মান, জার্মান বলে দরিদ্র জার্মানকে শোষণ করতে বিরত হয় না। জগতের বিভিন্ন দেশে, যেখানে আছে চাষী, যেখানে আছে মজুর, যেখানে আছে যত সর্বহারার দল, তারা সবাই সেই একই রকম কুকুর বেড়ালের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়···সেখানে আমরা সবাই এক···সবদেশের খেটে খাওয়া লোকেরা এক—

লিটিল রাশিয়ানের বক্তৃতা জনতা নিস্তব্ধ হয়ে শোনে। দেখতে

দেখতে ভীড়ও রীতিমত বেড়ে যায়। আবেগ কম্পিতকণ্ঠে লিটিল রাশিয়ান বলে চলে,—

আজ বিভিন্ন দেশের শ্রমিকেরা বুঝতে পেরেছে সেই সত্য···তাই পয়লা মে তারিখকে তারা নির্দিষ্ট করেছে, যেদিন সকল দেশের শ্রমিকেরা এই জগৎ-জোড়া ভ্রাতৃত্বের জন্যে উৎসব করে। দেশে দেশে এই দিন শ্রমিকেরা কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে বাইরে আকাশের তলায় একসঙ্গে এসে দাঁড়ায়। পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করে, জানতে চেষ্টা করে। সকল দেশের শ্রমিকরা যে এক···এই সত্যকে জীবনে সত্য বলে গ্রহণ করে। এইভাবে এই পয়লা মে-র উৎসবের ভেতর দিয়ে জেগে ওঠে সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সম্মিলিত শক্তির সম্ভাবনা। সাথী ভাইরা একবার চিৎকার করে বলুন—দুনিয়ার শ্রমিক এক হও···, মে দিবস জিন্দাবাদ···, শোষন নিপীরণ নিপাত যাক···

এমন সময় জনতার পেছন দিক থেকে কারা চীৎকার করে উঠলো, পুলিশ! পুলিশ!

লিটিল রাশিয়ান দেখলো রাস্তার ওপর দিয়ে একদল অশ্বারোহী সৈনিক এগিয়ে আসছে। তাদের দেখে জনতার পেছন দিককার লোক ছুটে পালাতে আরম্ভ করলো। কিন্তু আরোহীরা না থেমে জমায়েত পার হয়ে চলে গেল! তখন আবার এক-একজন করে ফিরে আসতে লাগলো। ক্রমশঃ ভীড় আবার জমে উঠলো।

পাভেল একটা উঁচু জায়গার ওপর উঠে দাঁড়ায়। সকলের দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ে। তখন হাতের পতাকাটা খুলে উঁচু করে তুলে ধরে পাভেল বলতে শুরু করে:

'···সাথীবন্ধুরা, আজ আমরা স্থির করেছি, আমরা এবার প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করবো। আজ সকলের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে বলতে চাই, কি আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা কি করতে চাই। তাই আজ এই পয়লা মে, তোমাদের সামনে এই রক্ত পতাকা তুলে ধরলাম, অন্তর থেকে বল ভাই, দীর্ঘজীবী হোক্ আমাদের এই চিরবঞ্চিত শ্রমিকদল··· শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যঃ জিন্দাবাদ!'



জনতার ভেতর থেকে অধিকাংশ লোক চীৎকার করে উঠলো, দীর্ঘজীবী হোক্ শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, পয়লা মে জিন্দাবাদ, শোষণ নিপীড়ন নিপাত যাক।

উৎসাহে পাভেল চীৎকার করে উঠলো,—'দীর্ঘজীবী হোক সকল দেশের সকল জাতির নির্যাতিত মানুষের দল!'

জনতার ভেতর থেকে একটা অপূর্ব হর্ষধ্বনি জেগে উঠলো। জনতাকে শান্ত হতে বলে লিটিল রাশিয়ান বলতে আরম্ভ করলো,···বন্ধুরা সব, আজ এইখানে এক নতুন দেবতার নামে, সাম্যের নামে, প্রীতির নামে, মুক্তির নামে আমরা এক নতুন তীর্থের পথে যাত্রা সুরু করলাম। জানি, দীর্ঘ এই পথ, বহু বিঘ্ন এই পথে, অনেক যন্ত্রণা হয়ত সহ্য করতে হবে এই পথে; তবু আমি নিশ্চিত জানি, একদিন আমরা এই পথের শেষে পৌঁছবই, জয় আমাদের হবেই। এই জনতার মধ্যে যদি কেউ এই সত্য বিশ্বাস না করে, যদি কেউ ভীরু থাকে, যে এই দীর্ঘসংগ্রামে ভয় পায় অথবা এই সত্যের জন্য যে প্রাণ দিতে পারবে না, আমার অনুরোধ তারা যেন না আসে আমাদের সঙ্গে। আজ আমাদের এই আহ্বান শুধু তার জন্যেই, যে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে আমাদের আদর্শকে। কে আছ আত্মবিশ্বাসী, কে আছ মৃত্যুর পথে বন্ধু, এগিয়ে এসো আমাদের সঙ্গে···আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ এই পয়লা মে-দিবসে গাও নিখিল নির্যাতিত মানুষের মুক্তির গান। মে-দিবস জিন্দাবাদ। শোষণ মুক্তির সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক।

পাভেল হাতের রক্ত পতাকা তুলে ধরে। তার পেছনে সারি বেঁধে শ্রমিকেরা শোভাযাত্রার জন্যে এসে দাঁড়ায়। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলতে শুরু করে। শত শত কণ্ঠে জেগে ওঠে গান,

···জাগো, জাগো, হে নির্যাতিত মানুষের দল
ঐ বাজে রণভেরী, এগিয়ে চল,
ক্ষুধিত মানুষের দল এগিয়ে চল।

মা বহুবার তাঁর নিজের ঘরে এই গান শুনেছেন, পাভেল চাপা গলায় গাইতো আর লিটিল রাশিয়ান তার সুরে শিষ দিতো। তখন

তিনি বুঝতে পারেন নি, এই গানের সার্থকতা কি! আজ ঘরের বাইরে শত শত মানুষের কণ্ঠে এই গানের যেন একটা নতুন রূপ ফুটে ওঠে। তারা গান গাইতে এগিয়ে চলে,

এগিয়ে চল
যেখানে রয়েছ যত বন্ধুরা,
বেদনায় যারা এক···

মা দেখেন, ভীড়ের চাপে পাভেলের কাছে থেকে তিনি একটু একটু করে অনেকখানি দূরে সরে এসেছেন। মাঝে মাঝে পাভেলের চেহারা ভীড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। তাই তিনি একদৃষ্টিতে পাভেলের হাতের রক্তপতাকার দিকে চেয়েছিলেন। জনতা গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে,

—যুদ্ধের জন্যে জারের চাই সৈন্য
আর কামানের জন্য খোরাক,
আমরা আমাদের ঘর খালি করে
জুগিয়ে চলেছি সেই খোরাক···

শোভাযাত্রা একজায়গায় এসে হঠাৎ থেমে পড়লো। শোভাযাত্রার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, পাথরের পাঁচিলের মত, মানুষের পাঁচিল, সঙ্গীনহাতে সৈনিকদের পাঁচিল। মা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখেন, ইটের পাঁচিলের মতন তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে···ইটের মতন তাদের প্রত্যেকের চেহারা এক। সেই মানুষের পাঁচিলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মার মনে হলো, মানুষগুলোর যেন মুখ নেই। প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে শুধু দেখা যাচ্ছে, খোলা বেয়নট···সূর্যের আলোয় ঝিক ঝিক করছে। মার চোখের সামনে হঠাৎ সব যেন ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। কানে আসে, ঝড়ের শব্দের মত, তাঁর ছেলের গলার আওয়াজ। পাভেল শোভাযাত্রাকারীদের বলছে,—ভাই সব, তবুও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে···থেমে গেলে চলবে না···

এগিয়ে চল···এগিয়ে চল···

পাভেল গান গেয়ে পা বাড়ায়, কিন্তু এতক্ষণ ধরে তার কণ্ঠের সঙ্গে

কণ্ঠ মিলিয়ে যারা গান গাইছিল ; তারা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। শুধু দু-একটা কণ্ঠ পাভেলের কণ্ঠের সঙ্গে যোগদান করলো···তারাও একে একে নীরব হয়ে গেল।

মার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এলো। বহুকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে মা চোখ চেয়ে দেখেন, সামনের সেই অগণিত লোকের ভীড় চোখের পলকের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে···চারদিকে লোক ছুটে পালাচ্ছে, মার কানে আসে শুধু সেই পালানোর শব্দ···সামনে চেয়ে দেখেন, সেই লাল পতাকা তখনো সামনে তেমনি রয়েছে, আর সেই লাল পতাকাকে ঘিরে মাত্র দশবারো জন লোক সেই মানুষের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে চলেছে। মা সেইদিকে এগিয়ে চলেন। এমন সময় দেখেন, লিটিল রাশিয়ান ছুটে পাভেলের সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

তাই দেখে পাভেল রেগে বলে উঠলো,—'একি, তুমি আমার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালে কেন ?'

লিটিল রাশিয়ান সে-কথার জবাব না দিয়ে পাভেলকে আগলে গান গেয়ে উঠলো।

কয়েকহাত দূরে নিশ্চল মানুষের পাঁচিল এবার নড়ে উঠলো। কে যেন গর্জন করে বললো,—এই মুহূর্তে ফিরে যাও বলছি !

পাভেল সে আদেশ কানে তোলে না। যেমন চলেছিল, তেমনি এগিয়ে চলে।

সেই কণ্ঠস্বর আবার গর্জে ওঠে,—'কেড়ে নাও ঐ পতাকা।'

নড়ে ওঠে নিশ্চল পাঁচিল।

পেছন দিক থেকে কারা চীৎকার করে ওঠে,—'পালিয়ে এসো, পাভেল। পালিয়ে এসো।'

—'পতাকাটা না হয় ফেলেই দাও না।'

এমন সময় নিকোলে পাভেলের পেছনে গিয়ে বলে,—'পতাকাটা আমার হাতে দাও, আমি লুকিয়ে ফেলছি।'

নিকোলের প্রস্তাবে পাভেল গর্জে ওঠে,—'খবরদার···না।'

এমন সময় একদল সৈন্য পাভেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো…জোর করে তার হাত থেকে পতাকাটা কেড়ে নিলো।

অফিসর আদেশ করলেন,—'গ্রেপ্তার কর!'

মা দেখলেন সোজা বেয়নট তুলে কয়েকজন সৈনিক পাভেলের দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। শুধু কানে এলো যন্ত্রণার একটা মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস, ওঃ।

তারপর দূর থেকে বাতাসে ভেসে এলো পাভেলের কণ্ঠ,—'মা, মা, বিদায়…'

সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো লিটিল রাশিয়ানের কণ্ঠস্বর,—'আমিও চল্লুম মা।'

চোখ বন্ধ করে মা বুঝলেন, তারা তাহলে মরেনি…বেঁচে আছে।

এমন সময় একজন সৈনিক ধাক্কা মেরে মাকে ফেলে দিয়ে গর্জে উঠলো,—'সরে যা এখান থেকে বুড়ি।'

মাটিতে পড়ে গিয়ে হঠাৎ মার চোখ গিয়ে পড়লো সেই সৈনিকটির পায়ের ওপর, দেখেন তার বুটের ফিতার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে পাভেলের হাতের পতাকার একটা ছেঁড়া টুকরো। তাড়াতাড়ি মা হাত বাড়িয়ে সৈনিকের পা থেকে সেই পতাকার অংশটুকু টেনে নেবার চেষ্টা করেন। সৈনিকের নজর পড়তেই জোর করে মার হাত থেকে সেই লাল পতাকার টুকরোটুকু কেড়ে নিয়ে মার সামনে বুট দিয়ে ঘসে ঘসে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

দূর থেকে ভেসে এলো, পাভেল আর লিটিল রাশিয়ানের কণ্ঠে,

—জগো, জাগো, হে নিদ্রিত সর্বহারা…

গান গাইতে গাইতে তারা এগিয়ে চলেছে কারাগারের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত অবশের মত মা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখ চাইতে দেখেন, সামনে জন প্রাণী নেই। সবাই সরে গিয়েছে। ধীরে ধীরে মা মাটী থেকে সেই বিমর্দিত পতাকার টুকরোটুকু বুকে তুলে নিলেন…তারপর ধীরে ধীরে পেছনে ফিরে বাড়ীর দিকে চললেন।

কিছুদূর গিয়ে দেখেন, গলির মোড়ে মোড়ে শ্রমিকেরা জটলা



করছে। তারা বলাবলি করছে,—'দেখলি, পাভেল কি রকম বেয়নটের সামনে এগিয়ে গেল?'

—'লিটিল রাশিয়ানই বা কম কি?'

—'ঠিক বলেছিস, দুটো হাত তার পিছমোড়া করে বেঁধেছে···তবুও তার মুখে হাসি লেগে আছে···'

ছেলেদের কীর্তির কথা শুনে গর্বে মার বুক দুলে ওঠে। সেইখানে দাঁড়িয়ে লোকদের ডেকে বলতে সুরু করেন,—'ওগো, ভগবানের দোহাই তোমরা শোন···অমন করে ভয়ে ছুটে পালিও না! দেখলে তো, তোমাদের সামনে, আমার বুকজোড়া ধন, সত্যের জন্যে, তোমাদেরই জন্যে, কিভাবে এগিয়ে গেল ··তোমাদের অন্ধকার দূর হবে বলে, ওরা নিজেদের জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে চলেছে···সবার সব দুঃখ দূর হবে বলে, ওরা আজ মাথা পেতে নিলো অসীম দুঃখের ভার···'

বলতে বলতে মার কণ্ঠ যেন শুকিয়ে এলো, তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন, তাঁর দেহের ভিতরে কি যেন এক আলোড়ন চলেছে···তাঁর শিরায় উপশিরায় যেন বিদ্যুতের মত কি বয়ে চলেছে! সেই বিদ্যুতের চেতনায় মা নিজের সব দুঃখের কথা ভুলে যান, ভুলে যান নিজের শোকের কথা, তাঁর মনের মধ্যে জেগে ওঠে সবার জন্য স্নেহ মমতা, এক সর্বংসহা জননীর সুবিশাল প্রতিমা···আর ছেলের আরব্ধ কাজকে শেষ করার সঙ্কল্প সেই নিমেষে তাঁর সমস্ত ভেতরটা বদলে দিয়ে গেল। যে-সব কথা তার কখনো মনে হয় নি, কোথা থেকে সেই সব কথা আপনা থেকে মনের ভেতর জেগে উঠতে থাকে। চেয়ে দেখেন, সামনের লোকজন নির্বাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছে, তাঁর কথা শোনবার জন্যে উদগ্রীব।

কে যেন মার ভেতর থেকে বলে উঠল,—ওরে, ঐ দেখ আনন্দ-লোকের দিকে চলেছে আমার আনন্দ-গোপালেরা! তাদের জন্যে আমি আর চোখের জল ফেলবো না, তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ, এই দুঃখিনী মায়ের অন্তরের অনুরোধ, ওদের একলা ফেলে তোমরা আর পালিও না···নিজেদের দিকে চেয়ে নিজেদের লজ্জা করতে শেখ।

হঠাৎ মার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। তিনি সেইখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

সেদিনকার উত্তেজনার পর মা বাড়ী ফিরে এসে শূন্যঘরে পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে বসে রইলেন। সারা দিন একা ঘরে মুখ বুঁজে পড়ে থাকেন। পাভেলের বইপত্র ঝাড়া পোছা করে গুছিয়ে রাখেন, লিটিল রাশিয়ানের পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করে তুলে রাখেন, কোনো কাজে আর তাঁর মন লাগে না। কখনো বা খোলা জানলা দিয়ে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন, স্পষ্ট যেন দেখতে পান তাঁর ছেলেদের পুলিস বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কানে বাজতে থাকে সেই বন্দী-অবস্থায় তাদের জয়-সঙ্গীত। চব্বিশ-ঘণ্টা সেই একই ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

মাঝে মাঝে দু-একজন প্রতিবেশিনী বাড়ীতে এসে তাকে সমবেদনা জানিয়ে যায়,—মা নীরবে শুধু শোনেন।

ওই দিনের পর থেকে মাঝে মাঝে পুলিশের লোকেরা হঠাৎ এসে ঘর-দোর খানা তল্লাসী করে চলে যায়। মা চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখেন।

মাঝে মাঝে মেরীয়ানা বুড়ী এসে মাকে সান্ত্বনা দেবার নানা চেষ্টা করে, কিন্তু মার মন কিছুতেই কোনো সান্ত্বনা মানতে চায় না। আজ তিনি বুঝতে পারছেন, নিজের দুঃখে, নিজের কষ্টে ঘরে বসে শুধু চোখের জল ফেলে কোনই লাভ নেই। আজ তিনি বুঝছেন জগৎ সংসারে তাঁরও দরকার আছে, সবাইএর দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য কাজ করলে তবেই নিজের দুঃখ দূর হবে। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তাঁর এই বোধ যখন এলো, তখন তাঁর জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কত কি যে শেখবার আছে, কিছুই ত তিনি শেখেন নি···একা একা এখন তিনি কিভাবে কি কাজ করবেন, ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

একদিন দুপুরবেলা আইভানোভিচ এসে উপস্থিত হলো। তাকে দেখেই মা শঙ্কিত হয়ে বলে ওঠেন,—'তুমি আবার এখন এখানে এলে কেন? পুলিশের লোকেরা যদি দেখতে পায়, এখুনি তোমাকে ধরে

নিয়ে যাবে।'

আইভানোভিচ হেসে বলে,—'দরকার আছে বলেই আমাকে আসতে হলো মা। আমি যে পাভেল আর লিটিল রাশিয়ানকে কথা দিয়েছিলাম—যদি তারা ধরা পড়ে, তাহলে আমি এসে আপনাকে আমার কাছে শহরে নিয়ে যাবো।'

এই প্রস্তাবে মা খুসীই হলেন। কিন্তু সংকোচের সাথে বল্লেন,—'আমি কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না, কোনো কাজ পাবো তো?'

আইভানোভিচ বলে—'তার জন্যে মোটেই ভাববেন না···যদি কাজ করতে চান, একটা কিছু কাজ জুটে যাবেই···'

কিন্তু মার কাছে আজ কাজ বলতে বোঝায়, যে কাজ করতে করতে তাঁর ছেলেরা জেলে গেছে। তাই তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলেন—'সত্যি বলছো, আমার করার মতন কাজ পাওয়া যাবে।'

আইভানোভিচ কিন্তু মার কথা বুঝতে পারেনি। তাই বল্লে,—'আপনি মা এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমার সংসারে আমার দিদি ছাড়া আর ত কেউ নেই···আপনি না হয় সংসারের কাজকর্মই দেখবেন···'

মা বলে উঠলেন,—'না, না, আমি সে কাজের কথা বলছি না বাবা? আমি তোমাদের মতন, জগতের কোন কাজ করতে···তোমাদের দলের কোনো কাজ করতে চাই।'

আইভানোভিচ বুঝতে পেরে আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—'সে কাজের তো কোনো অভাব নেই মা।'

তারপর গল্প করতে করতে আইভানোভিচ মাকে বিপ্লবীদের রাজনৈতিক কাজের সমস্ত ব্যাপারটা আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলে।

—'আমাদের এখন দরকার গাঁয়ের চাষীদের মধ্যে কাজ করা··· তারা বড় পিছিয়ে আছে। আপনার মনে আছে, সেই রাইবিনের কথা? খাঁটী গাঁয়ের চাষী···কাজ করবার জন্যে সে তখন আমাদের কাছে আস্তো,···কিন্তু তখন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম···সেই রাইবিনকেই এখন খুঁজে বার করতে হবে···

মা তাড়াতাড়ি বলেন,—'কিন্তু তার ঠিকানা ত আমার কাছেই আছে।

তোমাদের কাগজ-পত্র যা আছে, আমাকে এনে দাও। দেখো, আমি তার কাছে ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবো!'

উৎসাহে মার জীর্ণদেহ কেঁপে ওঠে। আবেগভরে বলেন,—'তোমাদের জন্মে দরকার হলে আমি সারা পৃথিবী চষে বেড়াতে পারি তোমাদের যদি ভাল হয়, তাহলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মাথায় করে সারা বছর ধরে আমি হেঁটে চলতে পারি।···যদি না মৃত্যু এসে আমাকে থামিয়ে দেয়, তবে আমি তোমাদের জন্যে, যেখানে দরকার সেখানে যাবো। এই বুড়ো বয়সে তোমরাই আমাকে শিখিয়েছ সত্যকে চিনতে, সত্যকে জানতে, আমার আর যে-কটা দিন আয়ু আছে, সেই কটা দিন আমি সেই সত্যের পথে চলবার চেষ্টা করবো, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা কববো, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার আর কি হতে পারে বল? যেখানে থাকবে আমার পাভেল, আমার আন্দ্রি, আমার ছেলেরা, সেইখানেই ত আমার ঘর···'

জোয়ারের মতন মার অন্তরে ধেয়ে আসে কথার তরঙ্গ···কোথা থেকে কিভাবে তারা যে আসে, মা নিজেই তা ভেবে পাম না।

মার আবেগ-ভরা কথায় আইভানোভিচ মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়, কিন্তু তবুও মাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে বলে,—'আপনি যে দায়িত্ব নিতে চলেছেন, সে-সম্বন্ধে আপনি ভালো করে ভেবে দেখেছেন তো মা?'

—'এতে আর ভেবে দেখবার কি আছে বাছা? একটা সামান্য গাছ, সে-ও ছায়া দেয়, কাঠ দেয়, মানুষকে জোগায় উত্তাপ। একটা সামান্য বোবা গাছ, সে-ও মানুষের কত কাজে লাগে। আর আমি মানুষ হয়েও মানুষের কোন কাজেই লাগবো না। দুধের বাছারা হাসতে হাসতে যে কাজের জন্মে প্রাণ দিতে ছুটতে পারে, আমি তাদের মা হয়ে চুপটী করে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো? সারাটা জীবন আমার কেটে গিয়েছে এই ছোট্ট ঘরের অন্ধকার কোণে, তখন এই

ঘরের বাইরে জগতকে আমি কিছুই জানতাম না; আজ তোমরা আমাকে সেই ছোট্ট ঘরের পাঁচিল ভেঙে বাইরের বিরাট জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছো···আমি এখন বুঝি তোমরা তোমাদের ছোট্ট নরম কাঁধে কি ভীষণ বোঝা তুলে নিয়েছো···আমি তাই চাই তোমাদের সেই বোঝার অংশ নিতে। দোহাই তোমাকে, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নাও, তোমাদের কাজের ভার দেও।'

এই নিরক্ষর নারীর অন্তর থেকে আজ আপনা হতে যে-সব কথা বেরিয়ে এলো, আইভানোভিচ তাতে অভিভূত হয়ে গেল। সগর্বে বলে উঠলো,—'মাগো, জীবনে এই প্রথম আজ তোমার মতন কোনো মায়ের মুখ থেকে যে-কথা শুনলাম সেরকম আর কখনো শুনি নি।'

দীর্ঘশ্বাসে মার বুক দুলে ওঠে।

—'ওরে, এই অভাগী মায়ের বুকে আজ যে সব কথা জমা হয়ে উঠেছে, তা যদি আমি সব বলতে পারতাম, তাহলে দুঃখে পাথর ফেটে জল ঝরে পড়তো, মানুষকে দুঃখ দিয়ে যারা আনন্দ পায়, তাদেরও বুক অনুশোচনায় কেঁপে উঠতো। মায়ের বুক থেকে যারা ছেলেদের ছিনিয়ে নেয়, মায়ের বুকে যারা আঘাত দেয়, কষ্ট দেয়,—আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। আমি তাদের জানিয়ে দিতে চাই, মায়ের বুকে ব্যাথা কেমন বাজে। যেমন যিশুকে তারা কষ্ট দিয়েছিল, সত্যের পথে চলার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। তেমনই আজ এরাও আমাদের বাছাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, জেলে আটকে রেখে সত্যের পথে চলা থেকে বন্ধ করতে চাইছে—কিন্তু আজ সবাইকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ওদের বাধাকে অতিক্রম করে আমরা সত্যের পথে চলবই।'

আইভানোভিচ বুঝলো, এখন তার আর বলবার কিছু নেই। মার শহরে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে সেই রাত্রিতেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আইভানোভিচ ফিরে যায়।

চারদিন পরে দুটো বাক্সতে সমস্ত জিনিষপত্র পুরে একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে মা শহরে আইভানোভিচের আস্তানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

শহরের যেদিকটা নির্জন, সেইখানে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা গলির মধ্যে পুরানো একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে ছিল আইভানোভিচের আস্তানা। একে ভাঙ্গা পুরানো বাড়ী, তার ওপর দেখাশোনার কেউ নেই। চারদিকে নোংরা আর এলোমেলো ভাব। উঠোনে কতকগুলো ফুলের গাছ রয়েছে, কিন্তু জলের অভাবে শুকিয়ে এসেছে। চারদিকে রাশীকৃত জঞ্জাল আর ঘরের ভেতর ছেঁড়া কাগজ আর বই এর স্তূপ। মা দু একদিনের মধ্যে সমস্ত বাড়ীটার চেহারা বদলে ফেললেন, ঘরগুলোর মধ্যে একটা শ্রী ফিরে এলো।

রাত্রিতে বিশ্রামের সময় আইভানোভিচ তার জীবনের সব কথা মাকে গল্প করে, এরই মধ্যে তাকে তিনবার কারাবাস করতে হয়েছে, শেষবারে দূর সাইবেরিয়া অঞ্চলে তাকে নির্বাসনে কাটাতে হয়েছিল। মা বিস্ময়ভরে লক্ষ্য করেন, এরা এদের জীবনের দুঃখকষ্টের কথা যখন বলে, তখন এনমভাবে বলে যেন তা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও করে না, কোন হাহুতাশও করে না। যেন জেলে-যাওয়া তাদের কাছে খাওয়া-দাওয়ার মতই একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

কথায় কথায় আইভানোভিচ বলে,—'আমার আপনার বলতে একটিমাত্র বোন আছে, আমার দিদি, কাল সে আসবে।'

মা জিজ্ঞসা করেন,—'তার বিয়ে হয় নি?'

—'হ্যাঁ, হয়েছিল। তার স্বামী সাইবেরিয়ার নির্বাসনে ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। সেই থেকে দিদি আমার বিধবা। এই যে দেখছেন পিয়ানো,—এ ত ওরই পিয়ানো—ভারী সুন্দর গান গায়—'

—'কোথায় থাকেন তিনি?'

—'সব জায়গায়! যেখানে বুক পেতে দেবার জন্যে, কাজ করার জন্য লোকের প্রয়োজন, সেইখানেই ছুটে যায় দিদি···'

—'তিনি তাহলে তোমাদের দলেরই একজন?'

—'নিশ্চয়ই। মানুষের মুক্তির জন্য সে তার জীবন উৎসর্গ করেছে।'

পরের দিন দুপুর বেলা আইভানোভিচ বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে, মা

একাই বাড়ীতে আছেন। এমন সময় একজন সুবেশা সুন্দরী নারী সোজা ঘরের ভেতর এসে ঢুকে পড়লো। নারীটির সাজ পোষাক দেখে মার মনে হল, এ নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বড়লোকের ঘরের মেয়ে।

কিন্তু মেয়েটি কোন রকম সঙ্কোচ না দেখিয়ে সোজা মাকে বললো, 'উঃ, ভারী তেষ্টা পেয়েছে ···একটু কফি, কি চা তৈরী করে দিতে পারেন ?'

মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন,—'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এক্ষুণি তৈরী করে দিচ্ছি।'

বিছানার ওপর দামী ওভারকোটটা রেখে মেয়েটি সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করে, —'আপনি নিশ্চয়ই পাভেলের মা ?'

মা ঘাড় নেড়ে বললেন,—'হ্যাঁ।'

মেয়েটা নিজের পরিচয় দিয়ে বলে,—'আমাকে চিনতে পারছেন নাতো, আমার নাম সোফিয়া, আমি আইভানোভিচের দিদি।'

মা অবাক হয়ে সোফিয়ার দিকে চেয়ে থাকেন।

সোফিয়া হেসে ওঠে, বলে,—'আপনি নিশ্চয়ই আমার সাজপোষাক দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন, না ? ভাবছেন, আইভানোভিচের দিদি কি করে এত বিলাসী হয় ? আমার গায়ে এই বড়মানুষী পোষাক যা দেখছেন, এ হলো আমার ছদ্মবেশ···সবজায়গায় ঘুরবার জন্য, পুলিসকে ঠকাবার জন্যে আমাদের এই সব ছদ্মবেশ নিতে হয় ··এতে সময়মত কাজের সুবিধা হয়। নইলে এই সব দামী পোযাক ছুঁতে পর্যন্ত আমার মন বিষিয়ে ওঠে।'

মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

এমন সময় আইভানোভিচ ফিরে এলো। সোফিয়াকে দেখেই সে কাজের কথা তুললো,—'তোমাকে যেজন্যে ডেকেছি, শোন। এখন আমাদের বিশেষভাবে দরকার, গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে কাজ করা। পাভেল জেলে যাবার আগে কয়েকজন চাষীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করেছিল। মা তাদের ঠিকানা জানেন। তুমি তাড়াতাড়ি মাকে সঙ্গে নিয়ে সেই গাঁয়ে চলে যাও। তাদের সঙ্গে

যোগাযোগের সমস্ত বন্দোবস্ত করে এসো !'

সোফিয়া উল্লসিত হয়ে ওঠে,—'চমৎকার ! আমি এখুনি প্রস্তুত। কোথায় কত দূরে সে গ্রাম ?'

—'এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল হবে !'

—'ঠিক আছে ! তা ভাই, যাবার আগে একটা গান গেয়ে আনন্দ করে যাওয়া যাক, কি বল ? মা, আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ?'

মা বিহ্বল হয়ে বলেন,—'না বাছা, আর আমার জন্যে তোমরা কিছু মনে করোনা ! গান করবে এতে আপত্তির কি থাকতে পারে।

সোফিয়া পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসে, আইভানোভিচের দিকে চেয়ে বলে,—'এটা হলো গ্রীগের রচনা, আমার প্রিয় সঙ্গীত !·· বাইরের দিকের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলে ভাল হয়, না হলে আওয়াজ অনেকদূর পর্যন্ত যাবে।'

আইভানোভিচ জানলাগুলো বন্ধ করে দেয়। সোফিয়া পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসে বাজাতে শুরু করে। চাবিগুলোর উপর দুহাত বুলোতেই আস্তে আস্তে সুরের ঝঙ্কার ওঠে। সুর কখনও সমুদ্রের গর্জনের মতো, কখনও পাতার মর্ম্মর ধ্বনির মতো, কখনও পাখীর কূজনের মতো, আবার কখনও ঝর্ণার শব্দ, কখনওবা ভয়াল বজ্রনির্ঘোষে যেন বিদ্রোহ জানায়, কখনও আনন্দে উচ্ছল, কখনও বা বিষণ্ণতায় ম্লান।

প্রথমদিকে মার এই বাজনাকে শুধুই শব্দের ঝঙ্কার ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না, কিন্তু সঙ্গীতের প্রভাবে ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে কেমন যেন বেদনাবোধ জেগে ওঠে। এরকম সঙ্গীত আর কখনও মা শোনেননি। তার অতীত জীবনের কথা মনে পড়তে থাকে। সেই ফেলে আসা নির্য্যাতন আর দুঃখময় জীবনের কথা। তাঁর মনে হল তিনি বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু জীবন থেকে তিনিতো কিছুই পাননি— পেয়েছেন শুধুই আঘাত, অপমান আর লাঞ্ছনা। গ্রীগের এই অপরূপ সঙ্গীত মার অজ্ঞাতে মার মনে জাগিয়ে তুললো, তার পুরোনো জীবনের রিক্ততা আর হাহাকার।

বাজনা শেষ হলে সোফিয়া আইভানোভিচকে জিজ্ঞাসা করলো,—



'কিরকম লাগলো ?'

অভিভূতের মতন আইভানোভিচ বলে,—'খুব সুন্দর! তোমার বাজনা শুনতে শুনতে আমার কি মনে হচ্ছিল জান? মানুষ যেন অনবরত প্রকৃতিকে প্রশ্ন করছে, অনবরত যেন কাঁদছে, আক্ষেপ করছে, নানাভাবে শুধু একটা প্রশ্নই করছে—কেন? কেন? প্রকৃতি কোন জবাব দেয় না, শুধু নীরবে ফুল ঝরিয়ে চলে। তার এই নীরবতা থেকে শুধু একটা উত্তরই শোনা যায়—আমি জানি না!'

ভাই-বোনের এই সূক্ষ্ম কথাবার্তা মা বুঝতে পারেন না···বোঝাবার কোন ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তখনও পর্যন্ত তাঁর মনে মনে গ্রীগের সঙ্গীতের সুর কাজ করে চলেছিল, তিনি নিজের জীবনের শূন্যতার মধ্যে ডুবে ছিলেন। তাঁর চোখের সামনে দুটো জগৎ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। একটা হলো, যে-জগতে তিনি এতদিন বাস করে এসেছেন···আর একটা জগৎ হলো, যা তিনি চোখের সামনে দেখছেন। যেখানে ভাই-বোন

কেমন বন্ধুর মতন সুখে বাস করছে, এক জন পড়ে আর একজন শোনে, একজন গান গায় আর একজন আনন্দ পায়···কেউ কাউকে আঘাত করে না, কেউ কাউকে লাঞ্ছনা দেয় না, একজনের অন্তরের কথা আর একজনের কাছে আনন্দে তুলে ধরে।

পিয়ানো থেকে ঘাড় ফিরিয়ে সোফিয়া আইভানোভিচকে ডেকে বলে,—'জানিস এই সঙ্গীতটা কোস্তিয়ার বড় ভালো লাগতো···প্রায়ই সে আমাকে বাজাতে বলতো···বাজাতাম···'

মা বুঝতে পারেন সোফিয়া তার মৃত স্বামীর কথাই বলছে। গানের সুরে তারও স্মৃতির দরজা গিয়েছে আজ খুলে। মার দিকে চেয়ে সোফিয়া ক্ষমা চায়,—'কিছু মনে করলেন না ত আপনি, খানিকটা চেঁচামিচি করলাম।'

মা সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়েন। নিজের বঞ্চিত জীবনের দুঃখের কাহিনী একটার পর একটা তাদের বলে চলেন। শুনে শুনে সোফিয়ার চোখ জলে ভরে উঠে। সে আবেগভরে বলে ওঠে—'এতদিন ভাবতাম, আমিই বুঝি খুব কষ্ট পেয়েছি কিন্তু আপনার জীবনের কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যিকারের দুঃখ কি, আমি জানতেই পারিনি। আপনার কথা শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম, এত দুঃখ সইবার ক্ষমতা মানুষ পায় কোথা থেকে ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন,—'তা আমি জানিনা মা, তবে এইটুকুই জানি, সব দুঃখই একদিন সয়ে যায়।'

আইভানোভিচ ঘরে বসে পড়ছিল। এমন সময় দু'টি ময়লা কাগজ কুড়নী মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। কাঁধে তাদের কাগজ কুড়োনোর থলে, হাতে লাঠি। আইভানোভিচ সোফিয়া আর মায়ের ছদ্মবেশ দেখে হেসে ওঠে। বিদায় নেবার সময়ে সোফিয়ার দিকে চেয়ে আইভানোভিচ বলে,—'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি সারা পৃথিবীর তীর্থ ঘুরতে বেড়োচ্ছো।'

পথে দুই কাগজকুড়নী নিজেদের জীবনের অন্তরঙ্গ কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেন।



শহরের বাঁধানো পথ ছাড়িয়ে তাঁরা দুজনে গ্রামের পথে এসে পড়েন। দুধারে শস্য ক্ষেত, মাঝখানে উঁচু-নীচু আলের পথ। সোফিয়ার দিকে চেয়ে মা সমবেদনায় বলেন,—'নিশ্চয়ই এপথে চলতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

সোফিয়া হেসে উঠে বলে,—'তুমিত জান না মা, এই ধরণের পথে কত দিন আমাকে হাঁটতে হয়েছে! এতে আমার কোন কষ্টই হয় না!'

পথ চলতে চলতে সোফিয়া তার বিপ্লবী জীবনের নানা গল্প মাকে বলতে থাকে। কেমন করে, কিভাবে, গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে; কেমন ভাবে পুলিশের লোকদের ফাঁকি দিয়ে পালাতে হয়েছে। মা অবাক হয়ে শোনেন তার সেই সব কাহিনী।

সোফিয়া বলে,—'জানেন মা, একবার কি রকম বিপদে পড়েছিলাম! একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি—দূর শহরে। যখন পৌঁছলাম তখন বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছে। বন্ধুর বাড়ীর দরজায় পৌঁছেই দেখি কি,

বন্ধুর ঘরে পুলিশ সার্চ করছে। যদি তখন সেখানে যাই, তাহলে আমিও ধরা পড়ে যাব। অথচ পালাবারও কোনো উপায় নেই। তাড়াতাড়ী করে পালাতে গেলে পুলিশ সন্দেহ করে পিছু নেবে। পাশের ফ্লাটে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবার ছিল, তাড়াতাড়ি তাদের ঘরে ঢুকে পড়লাম। যেন তাদেরই আপনার লোক···তারা তো অবাক, তাদের সব কথা বুঝিয়ে বললাম.—যদি আপনারা ইচ্ছা করেন আমাকে এখুনি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারেন কিন্তু আমি জানি আপনারা তা করবেন না। আমার কথায় তারা এমন অভিভূত হয়ে গেল যে সারারাত তারা আমাকে তাদের ঘরে লুকিয়ে রেখে দিলো। সার্চ করে পুলিশ চলে যেতে তখন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

এইভাবে সারাপথ সোফিয়া তার জীবনের যত সব অন্তরঙ্গ কাহিনী মাকে বলে চলে।

শুনতে শুনতে মা বলে ওঠেন,—'তোমরা বাপু, বড অদ্ভুত লোক··· লোকের মনের কথা তোমরা টেনে বার করে আনতে পার; সবাই এর সাথে এমন আপন করে মিশে যেতে পারো! তোমাদের সঙ্গে দুদণ্ড মিশলেই বোঝা যায়, তোমাদের কাছে থেকে কারও কোন ক্ষতি হবে না ··তাই আমি বলছি,—তোমরা দেখে নিও, তোমরাই শেষকালে জয়ী হবে।'

মার কথায় সোফিয়া বলে,—'আমরা কেন জয়ী হব জান? আমরা শ্রমিক আর কৃষকদের জাগাতে পেরেছি বলে! চিরকাল আমরা এদের অবজ্ঞা করে এসেছি, এদের ভেতর যে দুর্জয় প্রাণশক্তি ঘুমিয়ে আছে, তার খবর আমরা কোনদিন নিই নি! আজ আমরা সেই নতুন শক্তির সন্ধান পেয়েছি ·সে শক্তি যখন আত্মসচেতন হয়ে উঠবে, তখন কেউ আর তাদের আটক করে রাখতে পারবে না!'

কোথায় একটা লার্ক পাখী সুন্দর শিষ দিয়ে ওঠে। সোফিয়া আনন্দে সেই দিকে কান খাড়া করে তাকায়। পথের সামনে একটা লম্বা পাইন গাছ সোজা ওপরে উঠে গিয়েছে। সোফিয়া ছোট মেয়ের মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে,—কি সুন্দর!'

মা অবাক হয়ে চেয়ে ভাবেন। এই মাত্র যে জীবন-ধারণের কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করছিল, একটা সামান্য লার্ক পাখীর ডাকে, একটা সামান্য পাইন গাছ দেখে সে কেমন শিশুর মতন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। মা যতই দেখেন ততই স্নেহে আর বিস্ময়ে তাঁর মন ভরে ওঠে।

এইভাবে দূর পথ অতিক্রম করে তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট গাঁয়ে এসে পৌঁছলেন। পথে গাঁয়ের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তাঁরা রায়বিনের ডেরায় এসে উপস্থিত হলেন।

পথ থেকেই মা দেখতে পেলেন রাইবিন আর তিনজন চাষী বাইরে বসে খাওয়া দাওয়া করছে!

রাইবিনকে দেখেই মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের ছদ্মবেশের কথা ভুলে গেলেন। স্বাভাবিক স্নেহভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'কেমন আছ রাইবিন?'

রাইবিন ধীর পদক্ষেপে মার দিকে এগিয়ে আসছিল, এক দৃষ্টিতে মার পোষাক আর মুখের দিকে চেয়ে।

রাইবিন কাছাকাছি আসতেই মার মনে পড়লো, এখানে অপরিচিত নতুন লোক সব রয়েছে। এরকম আত্মহারা হওয়া তাঁর উচিত হয়নি। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—'হ্যাঁ বাবা, এই তীর্থ করতে বেরিয়েছি· ·এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম, পরিচিত লোক, একবার দেখা করেই যাই···'

মা লক্ষ্য করলেন, রাইবিন সোফিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তাই বলে উঠলেন,—'ও এটি ··এটি হলো আমার···হ্যাঁ···বন্ধু বলতে পার ··সঙ্গের সাথী ··নাম আন্না!'

মা যে এইভাবে কায়দা করে নিজেকে সামলে নিয়েছেন, সেকথাটা সোফিয়াকে বোঝাবার জন্যে গর্বভরে সোফিয়ার দিকে ফিরে চান।

রাইবিন কিন্তু মার সে সব কথা কানেই তুললো না, ধীরে মার সামনে এসে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলো,—'কেমন আছেন? কি ব্যাপার?'

তারপর ধীরে ধীরে মাথা নত করে সোফিয়াকে অভিবাদন জানিয়ে বলে উঠলো,—'দেখুন এখানে মিথ্যে মিথ্যে পরিচয় দেবার দরকার নেই ···এটা আপনাদের শহর নয়···এখানে কথা বানিয়ে বলবার কোন দরকার হয় না······বিশেষ করে, এই যে সব নতুন লোক দেখছেন, এরা সবাই আমার আপনার লোক! খাঁটি লোক সব!'

রাইবিন একে একে সঙ্গের লোকদের পরিচয় দিয়ে বললো,—'এই হলো ইয়েফিম্, আমার নিজের ভাই···আর এই দুজনের মধ্যে এর নাম হলো ইয়াকুব ··আর এর নাম হলো ইগনাট। এখন বলুন, আপনার ছেলে কেমন আছে?'

মা বুঝলেন, এখানে আর তাঁর ছদ্মবেশের কোন দরকার নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন,—'সে ত এখন জেলে।'

মার কথা শুনে ইগনাট্ বলে উঠলো,—'আবার জেলে! জেলই তার ভাল লাগে!' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত পরিচিতের মতন মার হাত থেকে পুঁটলিটি নিয়ে সামনের টুলের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,—'মা বসুন!'

রাইবিন সোফিয়াকে বলে,—'আপনি বসবেন না?'

রাইবিনের কথায় সোফিয়া একটা গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলো। রাইবিন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোফিয়াকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো।

ইত্যবসরে ইয়েফিম এক ভাঁড় দুধ জোগাড় করে উপস্থিত হলো। কাপে ভর্তি করে দুজনকে সেই গরম দুধ পরিবেশন করলো। নিমেষের মধ্যে তারা যেন চিরদিনের পরিচিত আপনার লোক হয়ে গেল।

মা একে একে মে-দিবসের উৎসব থেকে আরম্ভ করে, পাভেলদের গ্রেফতার হওয়া, পুলিশের সার্চ, সমস্ত ব্যাপার বলতে সুরু করলেন। নীরবে সেই গ্রাম্য কৃষকেরা মার কথা শুনছিল। সোফিয়া পাশ থেকে তাদের লক্ষ্য করছিল।

মার কথা শেষ হয়ে গেলে রাইবিন বলে উঠল,—'শুনলুম পাভেলের নাকি বিচার হবে।'

মা জবাব দেন,—'তাইতো শুনছি !'

—'কি রকম শাস্তি হতে পারে, সে-সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন নাকি ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুছে মা বলেন,—'সবাই বলছে, খুব কঠিন শাস্তি হবে···হয় অনেক বছর ধরে সশ্রম কারাবাস না হয় সাইবেরিয়ায় নির্বাসন !'

রাইবিন গম্ভীর ভাবে বলে,—'হুঁ পাভেল তো জেনে শুনেই একাজ করেছে, কি বলেন ?'

সোফিয়া এতক্ষন চুপ করে ছিল। রাইবিনের কথায় হঠাৎ সজোরে বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই।'

সোফিয়ার দিকে চেয়ে রাইবিন বলে,—'আমারও তাই বিশ্বাস। অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বার ছেলে ত সে নয়।

তারপর সঙ্গের চাষীদের দিকে চেয়ে বলে,—'বুঝেছ সে কি রকম ছেলে ? সে জানতো, সে যে-কাজ করতে চলেছে, তাতে হয়তো সৈন্যরা তাকে সেখানেই বেয়নেট দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে পারে···কিংবা চিরজীবনের মতন হয়তো সাইবেরিয়ায় তাকে নির্বাসিত হতে হবে, সে তা জানতো···তবু সে থামেনি···যদি তার পথের সামনে তার নিজের মা বাধা দেবার জন্যে শুয়েও পড়তো তাহলে সে মায়ের বুকের উপর দিয়েই হেঁটে চলে যেত ! তাই নয় মা ?'

রাইবিনের এই বিচিত্র সোজা প্রশ্নে মা চমকে ওঠেন। নিজেকে ঠিক করে নিয়ে বলেন,—'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ বাবা।'

হঠাৎ সবাই নীরব হয়ে যায়। দূরে কোথায় একটা দাঁড়কাক ডেকে ওঠে। ওক আর বার্চের বিরাট ছায়া ঘন হয়ে আসে।

ইয়াকুব বলে ওঠে,—'তাহলে কি বলতে চাও পাভেলের মতন লোকের বিরুদ্ধে ওরা আমাদেরই পাঠাবে ?'

রাইবিন বলে ওঠে,—'তাছাড়া আর কাকে পাঠাবে বলে তুমি মনে কর ? আমাদের হাত দিয়েই ওরা আমাদের আঘাত করে···এই ত হলো ওদের কায়দা।'

—'তা যাই হোক্, আমি কিন্তু ঠিক করেছি সৈনিক হবো,—

ইয়েফিম্ বলে।

রাইবিন জবাব দেয়,—'তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে? সৈনিক হতে চাও···হও···শুধু ভাই একটা অনুরোধ, যদি কোন দিন দেখ, আমাকেই গুলি করতে হচ্ছে তখন সোজা এই মগজের খুলি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ো··· যেন এক গুলিতেই শেষ হয়ে যাই···নইলে সারা জীবন খোঁড়া অথর্ব হয়ে পড়ে থাকব, এ আমি চাইনা।'

ইয়েফিম গম্ভীরকণ্ঠে বলে,— 'ও আর নতুন কি বল্লে? অনেকবারইত তোমার মুখে শুনেছি!'

'ওসব কথা এখন থাক'—রাইবিন বলে ওঠে। এখন কথা হচ্ছে এই যে স্ত্রীলোকটিকে দেখছো, এর ছেলে, এক মাত্র ছেলে হয়ত এতক্ষণে সাবাড় হয়ে গিয়েছে···'

মা চীৎকার করে ওঠেন,—'এ কি তুমি বলছো বাছা!'

রাইবিন গম্ভীরভাবে জবাব দেয়,—'ওসব কথায় আপনি কান দেবেন না···আমাদের কথাবার্ত্তাই এই রকম—সে যাক—আসল কথা, বিলি করবার জন্য কাগজ-পত্র এনেছেন?'

হ্যাঁ, কি না,···কি জবাব দেওয়া উচিত হবে, কয়েক মুহূর্ত্ত মা ভেবে নেন। চার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেন। তারপর জবাব দেন,—'হ্যাঁ এনেছি!'

রাইবিন সামনের টেবিলে সজোরে ঘুষি মেরে সঙ্গের লোকদের দিকে চেয়ে বলে ওঠে,—'বুঝছিস ব্যাপারটা?'

তারপর মার দিকে চেয়ে বলে,—'যে মুহূর্তে আপনাকে দেখেছি সেই মুহূর্তেই আমি জেনেছি, কেন আপনি এসেছেন। বুঝলি তোরা কিছু? ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে···তার জায়গায় মা এসে দাঁড়িয়েছে।'

রাইবিন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—'কিছুদিন আগে আমাদের এখানকার পুলিশের কর্ত্তা আমাকে পুলিশ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখেই সে গর্জে উঠলো,—গির্জের পুরোহিতের সঙ্গে কি ঝগড়া করেছিলি পাজী! আমি তক্ষুনি বলে উঠলাম,—আমাকে পাজী বলছো কিসের জন্যে? আমি কি চুরি

করে খাই, না কাউকে কষ্ট দি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করি। উত্তর শুনে কর্তা দাঁতে দাঁত চেপে তক্ষুনি হুকুম দিলো—তিনদিন জেলে থাক! মনে মনে ভাবলাম, এই ভাবেই তোমরা সাধারণ লোকের সঙ্গে ব্যবহার কর। কিন্তু আজ না হয় কাল, আমি না পারি অন্য কেউ, সুদে আসলে তোমাদের কড়ি তোমাদেরই ফিরিয়ে দেবে···তোমাদের লোহার তৈরী নখ দিয়ে মানুষের বুক চিরে চিরে তোমরা সেখানে ঘৃণার বীজ ছড়িয়েছে···সেই ঘৃণার বীজ থেকে শয়তানের দল, ঘৃণার অঙ্কুরই শুধু গজাবে।'

রাগে আর ক্ষুব্ধ আক্রোশে তার সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে। তার ভেতর থেকে কথা যেন উথলে উঠতে থাকে।

—'পুরুতের সঙ্গে আমার কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল জানেন? তিনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে শেখো! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের মেষের মত ধৈর্য দেন। আমি তার উত্তরে বলেছিলাম—তাহলে নেকড়েদের খুব সুবিধাই হয়। আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে পুরোহিত বলে উঠলেন,—তুমি প্রার্থনা কর? করজোরে বল্লাম,—নিশ্চয়ই, প্রার্থনা করি বই কি? মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—কি প্রার্থনা কর? আমি বল্লাম,—আমি প্রার্থনা করি, হে ভগবান, যারা মানুষকে চড়িয়ে খায়, তাদের শেখাও কি করে মোট বইতে হয়, কি কোরে উপোস দিয়ে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়···

এমন সময় হঠাৎ রাইবিন ছদ্মবেশী সোফিয়ার দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—'আপনিও তো সেই মনিবদেরই ঘরের মেয়ে?'

হঠাৎ এইভাবে এই প্রশ্ন শুনে সোফিয়া থতমত খেয়ে উঠলো, ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে,—'আমার সম্বন্ধে আপনার এ-ধারণা কি করে হলো?'

অবিচলিতভাবে রাইবিন বলল,—'আপনি যখন থেকে এসেছেন, তখন থেকেই আমি আপনাকে লক্ষ্য করছি, যদিও আপনি গরীব কাগজ-কুড়ুনির পোষাক পরেছেন, কিন্তু তার ভেতর থেকে আপনার আভিজাত্য



ফুটে উঠছে···এই কিছুক্ষণ আগে ঠাণ্ডা কাঠের ওপর কনুই দিতে গিয়ে আপনি চমকে কনুই তুলে নিলেন! কোন চাষীর মেয়ে তা করতো না! ভিজে টেবিলে হাত রাখার অভ্যেস এখনো আপনার হয়নি। আপনার মেরুদণ্ড এখনো সোজা রয়েছে, আপনার বয়সে চাষীর ঘরের মেয়েদের মেরুদণ্ড বঁড়সীর মতন বেঁকে যায়।'

রাইবিনের এই ধরণের স্পষ্ট কথায় মা ভীত হয়ে পড়লেন, তাঁর মনে হলো, হয়ত সোফিয়া অপমানিত বোধ করবে, রেগে যাবে। তাই তিনি রাইবিনকে একরকম ধমক দিয়েই বলে উঠলেন,—'এ সব তুমি কি বলছো? সোফিয়া হলো আমাদের আপনার লোক, আমার বন্ধু··· তোমাদের জন্যে খেটে খেটে দেখছো না, এই বয়সেই ওর মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে?'

রাইবিন তাড়াতাড়ি সোফিয়ার দিকে চেয়ে অপরাধীর মতন বলে ওঠে,—'আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আঘাত করার জন্যে আমি কিন্তু একথা বলিনি!'

সোফিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলে ওঠে,—'না···না···আমি এ কথায় কিছু মনে করি নি!'

রাইবিন কথার বিষয় বদলাবার জন্যে বলে,—'আমাদের এখানে একজন নতুন লোক এসেছে···ইয়াকুবের সম্পর্কে ভাই হয়। বেচারা বেয়াড়া রকমের, হাঁপানিতে ভুগছে··· আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়···তাকে ডেকে পাঠাবো?'

সোফিয়া জবাব দেয়,—'হ্যাঁ নিশ্চয়ই!'

মার দিকে চেয়ে রাইবিন বলে,—'আপনাদের আর আটকে রাখবো না···অনেকটা পথ এসেছেন···বিশ্রামের দরকার,···ইয়াকুব আস্তাবলের ওপর থেকে কিছু খড় আর শুকনো পাতা বিছিয়ে দেনা ভাই···হ্যাঁ, কাগজ-পত্রগুলো কই?'

মা পোষাকের ভেতর থেকে একে একে ছাপান কাগজের বাণ্ডিল-গুলো বার করেন। সোফিয়া সেগুলো রাইবিনের সামনে ধরে।

—'ইস্···বহুত কাগজ এনেছেন দেখছি···'

তারপর সোফিয়ার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে,—'অনেক দিন তা হলে এ কাজ করছেন?'

সোফিয়া গম্ভীরভাবে বলে,—'হ্যাঁ!'

—'জেলেও গিয়েছেন তাহলে?'

—'বহুবার!'

মা সেই ফাঁকে বলে ওঠেন,—'আর তুমি বাছা, ওকে বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলে!'

রাইবিন হেসে বলে,—'কিছু মনে করবেন না মা! আমরা হলাম চাষাভুষা লোক··· তেলে আর জলে যেমন মিশ খায় না তেমনি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের মতন ছোটলোকদের মিশ খায় না!'

সোফিয়া প্রতিবাদ করে ওঠে,—'আমি ভদ্রলোক নই!'

রাইবিন তাতেও দমে না—'বলে, ভালই! কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন? লোকে বলে, আজকে যারা কুকুর, তারাই নাকি একদিন নেকড়ে বাঘ ছিল··সে যাক্··এখন মালগুলি লুকিয়ে ফেলি তাড়াতাড়ি!'

তারা সবাই সেখান থেকে উঠে একটা আস্তাবলে গিয়ে উঠলো। একটা উঁচু মাচার ওপর মা শুয়ে পড়লেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সোফিয়া তার মাথার কাছে বসে বোলতা আর মাছি তাড়াতে লাগলো। চারদিক থেকে দুর্গন্ধ উঠছে আর সেই দুর্গন্ধে বোলতারা প্রাণের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নীচে ইয়াকুব একটা কাগজ নিয়ে একমনে পড়তে থাকে। কিছুক্ষণ পরে রাইবিন উঠে দাঁড়ায়। মার ঘুমন্ত মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠে,—'এই বোধহয় প্রথম, এই রাস্তায় ছেলের পেছনে পেছনে মাও বেরিয়ে এলো। চলো, ওঁদের ঘুমোতে দাও!'

সঙ্গীদের নিয়ে রাইবিন বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার আগে যে-যার কাজ সেরে আবার ফিরে এলো। সারাদিনের পরিশ্রমের দরুণ রাইবিনের মনের উত্তেজনা এখন আপনা থেকেই খানিকটা নরম হয়ে এসেছে। ইগনাটকে ডেকে রাইবিন বলে,—'আজ

তোমার পালা ইগনাই,—একটু চা তৈরী কর।'

এমন সময় দূর থেকে একটা ক্রমাগত কাশির আওয়াজ এলো।

রাইবিন কান খাড়া করে শোনে। সোফিয়াকে বলে,—'সেই লোকটা আসছে···একটা জীবন্ত প্রতিবাদ···আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে লোকটাকে আমি রুশিয়ার প্রত্যেক শহরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতাম···শহরের লোকদের ডেকে বলতাম,—শোন ওর মুখ থেকে ওর যা বলবার আছে··যদিও একটী মাত্র কথাই ওর বলবার আছে···আর সেইটেই ও বারে বারে বলে······।'

বাইরে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে আসে, ছায়া যত ঘন হয়ে আসে, মানুষগুলোর কথাও তত শান্ত কোমল হয়ে ওঠে। সামনে বনের ভিতর থেকে এমন সময় দীর্ঘকায় একটি শীর্ণ লোক বেরিয়ে এল···আস্তে আস্তে আস্তাবলের দিকে সে এগিয়ে চল্লো।

দরজার কাছে এসে সে কাশতে কাশতে বলে উঠল,—'তাহলে আসতে পারলাম দেখছি!' সোফিয়ার দিকে চেয়ে বল্লো—'শুনলাম আপনারা নাকি শহর থেকে অনেক বই পত্র নিয়ে এসেছেন?'

সোফিয়ার হয়ে রাইবিন জবাব দেয়,—'হ্যাঁ।' তারপর সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে,—'এর নাম হল সেভিলি···এর কথাই আপনাদের বলছিলাম।'

পরিচয় দেওয়া-নেওয়া শেষ হয়ে গেলে সেভিলি সোফিয়ার দিকে চেয়ে বলে,—'এদের সবার হয়ে—এই গাঁয়েব চাষীদের হয়ে, আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই! আপনারা আজ এদের কাছে যে-জিনিষ পৌঁছে দিলেন এরা জানেইনা তার কি দাম! আমি জানি, তাই এদের হয়ে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি!'

কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ হাঁফের টানে তার সরু বুকটা দুলতে থাকে! নিঃশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ বুঝতে পারা যায় কি দারুণ কষ্ট হচ্ছে তার। হাড় বার-করা মুখের মধ্যে কোটরে-ঢোকা চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়।

তার দেহের অবস্থা দেখে সোফিয়া সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বলে,—

'এই ভিজে সন্ধ্যায় এইভাবে বনের মধ্যে থাকা আপনার পক্ষে মোটেই ভাল নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেভেলি বলে,—'আমার জীবনে আর ভাল বলে কিছু নেই—কিছু হবেও না ··একটি মাত্র জিনিসই বাকি আছে হবার···তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি···বাকি আছে শুধু মরা!'

ইয়াকুব শুকনো খড় পাতা এনে আগুন জ্বালে। অন্ধকারে আগুনের চাপা লাল আভা সকলের মুখে চোখে গিয়ে পড়ে।

সেভিলি হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলতে শুরু করে,—'তবু একটা কথা ভাবি···মরবার আগে মানুষের, আমার মতন যারা সাধারণ মানুষ, তাদের যদি কোনো উপকার করে যেতে পারি···সারা দেশ জুড়ে যে মহাপাপ ঘটে চলেছে, আমি হলাম তার এক সাক্ষী··· এই চেয়ে দেখুন আমার দিকে? বলতে পারেন আমার বয়স কত? বিশ্বাস করবেন, আমার বয়স মাত্র আটাশ! দশ বছর আগে আমি এই কাঁধে অনায়াসে পাঁচশো পাউণ্ডের বোঝা নিয়ে হাটতে পারতাম··· তখন ভাবতাম, আমার যেরকম স্বাস্থ্য, তাতে আমি এই স্বাস্থ্য নিয়েই অনায়াসে সত্তর বছর পার করে দিতে পারবো। কিন্তু দশবছর—মাত্র দশ বছর যেতে না যেতে আমি কবরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি···আমার মনিবেরা আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে আমার জীবনের চল্লিশটা বছর···'

রাইবিন ঘাড় তুলে শুষ্ককণ্ঠে বলে,—'ঐ হল ওর একমাত্র কথা!'

সেভিলি প্রতিবাদ করে ওঠে,—'এটা যদি একান্ত আমারই কথা হতো, তাহলে আর বলতাম না। কিন্তু এতো আমার একার কথা নয় ···এ হলো হাজার হাজার লোকের কথা···আমি বলতে জানি···তারা বলতে জানে না···বলতে পারে না···তাই তাদের সকলের হয়ে আমি এই কথা জগৎকে বলে যেতে চাই······'

সেভিলি উত্তেজনায় ধুকতে থাকে; মনে হয়, যেন এক্ষুণি পড়ে যাবে। সোফিয়া মৃদু ভৎসনার সুরে রাইবিনকে বলে,—'জেনে শুনে কেন ওকে এখানে আসতে বললেন? ওযে এখুনি মরে যাবে।'

অবিচলিতভাবে রাইবিন বলে,—'আমি তা জানি···তাই ও যতক্ষণ না মরে, কথা বলুক···ওর যা বলার আছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত—ও তা বলে যাক! সমস্ত জীবন ওর নষ্ট হয়ে গিয়েছে অকারণে—যেটুকু জীবন বাকি আছে, তা যদি ভাল কাজে নষ্ট হয়ে যায়, তা হলেও···তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই।'

সোফিয়ার কোমল অন্তর রাইবিনের সেই উদাসীনতাকে সহ্য করতে পারে না—সোফিয়া বলে ওঠে,—'লোকটা যদি এই ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়ে মরে যায়, তাতে মনে হচ্ছে আপনি খুশীই হবেন।'

রাইবিন তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—'সে অভ্যাস আমাদের নেই। সেটা হোল ভদ্রলোকদের অভ্যাস—যাঁরা যিশুখৃষ্টকে ক্রুশে আর্তনাদ করতে দেখে আহ্লাদে গদগদ হয়ে উঠেছিলো। আমার বক্তব্য হলো, যতক্ষণ এ লোকটা বেঁচে আছে, ততক্ষণ তার কাছ থেকে আমাদের যা কিছু শেখবার তা আমরা আদায় করে নেবো, আপনারাও তা শিখে নিন।'

তাদের দুজনার কথাবার্তার ধরণে মা আবার ভীত হয়ে ওঠেন, বলেন,—'আচ্ছা থাক্ থাক্।

অন্ধকারে সেভিলি যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে সে যেন আপনার মনে বলতে থাকে,—'মানুষকে তারা এমন ভাবে খাটাবে যাতে মানুষ মরে যাবে। কেন, কেন তা হবে? কেন মানুষের জীবন থেকে তারা চুরি করে নেবে মানুষের আয়ু! যে কারখানায় কাজ করে আমার এই অবস্থা, শুধু আমার নয়, আমার মতো আরও অনেক মজুরের এই অবস্থা, সেই কারখানার মালিক একজন থিয়েটারের গায়িকাকে উপহার দিলেন, সোনার একটা গামলা—সেই সোনার গামলায় গায়িকা মুখ ধোবেন! সেই সোনার গামলার প্রত্যেক কণিকার সঙ্গে মিশে আছে আমার জীবনের চল্লিশটা বছরের আয়ু! দেখুন একজন থিয়েটারের গায়িকা মুখ ধোবে বলে চলে গেল আমার জীবনের আয়ু!

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সেভিলির দুর্বল দেহ সেই নিদারুণ উৎসাহ সহ্য করতে পারলো না। সেভিলি সেইখানেই শুয়ে পড়ে

কাশতে লাগলো। রাইবিনের নির্দেশে ইয়াকুব আর একজন চাষী মিলে সেভিলিকে চালাঘরের ভেতর শুইয়ে দিলো।

চারদিকে জমাট বেঁধে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার। রাইবিন কাঠের আগুনটাকে খুঁচিয়ে শিখাময় করে তোলে। সেই রক্ত-শিখার আঁচ গিয়ে পড়ে চাষীদের মুখে চোখে। সেভিলির কথাবার্তা আর অবস্থা সোফিয়ার মনে জাগিয়ে তোলে, জগতের নিপীড়িত মানুষদের অসহায় বেদনার কাহিনী, এ দুঃখ একা সেভিলির নয়, এ অভিযোগ একা সেভিলির নয়,—আজ দেশে দেশে যারা জনতার অধিকাংশ—তারাই এক হৃদয়-হীন, মনুষ্যত্বহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে পিষে মারা যাচ্ছে। সোফিয়া তাদের কাহিনী বলতে আরম্ভ করে, সেই সামান্য গ্রামের রাত্রি···অন্ধকারে সেই অগ্নিকুণ্ডের রক্ত-আলোয় ক্ষণ-কালের জন্যে যেন চলমান ছবির মত জেগে ওঠে—ইতালী, ফ্রান্স জার্মানি, ইংলণ্ড। জগতের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের জীবনের ছবি—একই অত্যাচারে, একই অভাবে, তারা সবাই এক।

চাষীরা চোখ বড় বড় করে পাথরের মতন নিশ্চল হয়ে সেই সব কাহিনী শোনে। সোফিয়া শুধু যে তাদের বেদনার কাহিনী বলে, তা নয়, বলে সেই বেদনাকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে তাদের দুরন্ত মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী। গল্পের পর গল্প বলে চলে। অতি সামান্য লোক যারা, মুর্খ ছোটলোক বলে পরিচিত, তারা এই মুক্তি সংগ্রামে যে বীরত্ব, যে ত্যাগ, যে নিষ্ঠা, যে কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিচ্ছে, তাতে প্রবল বলশালী শত্রু-মনিবেরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠেছে।

আত্ম-প্রত্যয়ের জীবন্ত মূর্তির মতন সোফিয়া শেষকালে বলে,—'তোমরা ভাই, জেনে রাখো, আমাদের সামনেই শিগ্‌গির সেদিন আসছে, যেদিন জগতের সকল দেশের মজুরেরা, খেটে খাওয়া মানুষেরা এক হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তখন তারা বুক ফুলিয়ে অত্যাচারীদের মুখের ওপর বলবে,—আমরা আর মানুষের পৃথিবীতে হতে দেবো না মানুষের লাঞ্ছনা। সেই দিনই টলে পড়বে লোভী অত্যাচারীর প্রতিষ্ঠিত শক্তির সিংহাসন—'

সোফিয়ার কথা শুনতে শুনতে সেই সব দরিদ্র অজ্ঞ চাষীদের মনে জেগে ওঠে এক নতুন চেতনা, যেন তারা বিচ্ছিন্ন নয়, অসহায় নয়, দেশে দেশে আছে তাদের আপনার জন। বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষদের সাথে এক অদৃশ্য আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা হয়ে যায় তাদের মন। সকালে যেসব চাষী উদাসীন ছিল, রাত্রিতে সেই কাঠের আলোয়, সোফিয়ার কথায়, কোথায় ভেসে চলে গেল তাদের সেই কাঠিন্য, সেই উদাসীন ভাব। সোফিয়া যখন কথা বলছিল, তখন এক সময় ইয়াকুব একটা চাদর নিয়ে এসে নিঃশব্দে সোফিয়ার আর মায়ের পিঠে জড়িয়ে দেয়।

এই ভাবে সারারাত্রি ধরে সোফিয়া গল্প বলে চলে, স্তূপাকার কাঠের ছাই আর কাঠ কয়লা জমে ওঠে, বনের ধার দিয়ে ফিকে হয়ে আসে রাতের অন্ধকার।

ভোরের মুরগীর ডাকে সকলে সচেতন হয়ে ওঠে।

রাইবিন হাই তুলে বলে, —'তা হলে ভোর হলো ?'

সোফিয়া বলে,—'এই আলো-আঁধারীতেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে—এই উষা হলো আমাদের যাওয়ার শুভ-লগ্ন ! তাহলে এবার বন্ধু, বিদায়ের পালা !'

সোফিয়ার মুখে বিদায়ের কথায় সকলের বুক থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে।

রাইবিন সোফিয়ার কাছে এসে বলে,—'শহরে গেলে কোথায় আপনার দেখা পাবো ?'

সোফিয়ার ঠিকানা দিয়ে দেয়। এই সব সরল প্রাণ চাষীদের ছেড়ে চলে যেতে মার দুচোখ জলে ভরে আসে। হঠাৎ নজর পড়ে রাইবিনের বিরাট বুকটা খোলা, জামায় বোতাম নেই, পায়ের দিকে চেয়ে দেখেন, খালি পা মোজা নেই!

রাইবিনকে পাশে টেনে নিয়ে বলেন,—'হ্যাঁরে ঠাণ্ডা লাগবে যে!'

রাইবিন উন্মুক্ত বুকে হাত দিয়ে বলে,—'মাগো, এই বুকের তলায় আগুন জ্বলছে, ঠাণ্ডা লাগেনা তাই!'

কথায় কথায় বিদায়ের লগ্ন এসে পড়ে। সোফিয়াকে পাশে নিয়ে



মা আবার সামনের দিকে পা ফেলেন।

চাষীরা সমবেত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে,—'বিদায়! বিদায়!'

বহুদূর পর্যন্ত তার প্রতিধ্বনি মায়ের পায়ে পায়ে যেন জড়িয়ে যায়।

গ্রাম থেকে ফিরে এসে মা আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। সোফিয়া হঠাৎ কোথায় চলে যায়, চার-পাঁচদিন আর তার দেখা পাওয়া যায় না; চার-পাঁচদিন পরে হঠাৎ এসে, এক ঘণ্টা নেচে গেয়ে হেসে, আবার তক্ষুণি ঢেউএর মত কোথায় ভেসে চলে যায়। মা অবাক হয়ে তার যাওয়া আসার পথে চেয়ে থাকেন।

আইভানোভিচ্ অবশ্য বাড়ীতেই থাকে। কিন্তু সর্বদাই কাজে ব্যস্ত। তার সমস্ত দিন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাঁধা। কোন্ সময়ে কি কাজ করতে হবে তার যেন মুখস্থ, তার এতটুকু নড়চড় হবার জো নেই। রোজ সকালবেলা চা খেয়ে সে খবরের কাগজ পড়তে বসে এবং তখন মাকে ডেকে দরকারি খবরগুলো পড়ে শোনায়। ঠিক ঘড়িতে ন'টা বাজতেই পড়া শেষ করে সে অফিসের কাজে বেরিয়ে যায়।

তখন মা ঘরদোর পরিষ্কার করতে লেগে যান। তারপর রান্নাঘরে ঢোকেন।

দুপুর বেলা যখন কেউ থাকে না, তখন মা আলমারীর বইগুলো রোজ ধুলো ঝেড়ে সাজিয়ে রাখেন। এক-একটা বই বার করে পড়তে বসেন, কিন্তু বানান করে পড়তে পড়তে কিছুক্ষণ পরেই হতাশ হয়ে পড়েন। বানান করে কোন রকমে উচ্চারণ করেন—কিন্তু অর্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারেন না। নিজের উপর জেগে ওঠে নিদারুণ ধিক্কার। সব চেয়ে তার ভাল লাগে ছবির বই। একটি একটি করে উল্টে দেখেন কত জাহাজ, কত পাহাড়, কত নূতন নূতন দেশের আর মানুষের ছবি। তার মনে জেগে ওঠে অপরূপ চেতনা, কত বড় এই পৃথিবী তার কতটুকুই বা তিনি দেখেছেন!

সেই চেতনার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে এক নিদারুণ বাসনা, কি করে দেখা যায়, কি করে বোঝা যায়, এই বিরাট পৃথিবীকে!

একদিন খাবার সময় মা আইভানোভিচের সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলে ওঠেন,—'কত বড় এই পৃথিবী!'

আইভানোভিচ হেসে বলে,—'তবুও তাতে সমস্ত মানুষের খাবার আর থাকবার জায়গা হয় না···অধিকাংশ মানুষকে অখাদ্য অথবা আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় আর জন্তুর মতন বাস করতে হয় কুঁড়েঘরে!'

কয়েক দিন পর থেকে আবার সন্ধ্যাবেলায় সব লোকজন থেকে আসতে আরম্ভ করলো। নতুন নতুন সব লোক, আলেক্সি, আইভান, পেট্রোভিচ, ইয়াগর! ঘরের ভেতর বসে তাদের আলোচনা সভা! মা চুপটী করে তাদের কথাবার্তা শোনেন। মাঝে মাঝে শাশাঙ্কাও আসতো। বেশীক্ষণ থাকতো না, কাজের কথা ছাড়া বিশেষ কিছু বলতো না—আর ভুলেও হাসতো না। ঠিক যেন সোফিয়ার উল্টো দিক!

একদিন শাশাঙ্কার সঙ্গে দেখা হলে মা পাভেলের কথা তুললেন: বললেন—'এতদিন ধরে কেন ওরা পাভেলকে বিনা বিচারে হাজতে আটকে রেখেছে···এটা কি অন্যায়?'

শাশাঙ্কা কোন জবাবই দিলো না।

নাতাশাও আসতো, কিন্তু খুব কম। শহরে একটা স্কুলে মাষ্টারী করে, ছুটি পায় না। অবসর সময়ে শহরের কারখানায় কারখানায় সে নিষিদ্ধ বই-পত্র বিলি করে। নানা রকম ছদ্মবেশে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়, গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে।

একদিন নাতাশা এসে বলে—তার মা মারা গেছেন। মা ওকে সান্ত্বনা দেন। মা ওর সাথে সাথে কাজ করেন। নানা ছদ্মবেশে ইস্তাহার, বিজ্ঞপ্তি ও খবরের কাগজ নাতাশাকে পৌঁছে দেন আবার মাঝে মাঝে নিজেই নানা জায়গায় পৌঁছে দেন। নানান ধরণের লোকের সাথে আলাপ হয়। জীবনে যার দুঃখ আছে, আছে অসন্তোষ এমন লোকের সাথে দেখা হলে তিনি সন্তুষ্টই হন।

আগে তার মনে হতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেই, গির্জায় যেয়ে পাদ্রী পুরোহিতের আশীর্বাদ নিলেই দুঃখ দুর্দশা দূর হবে। তার এখন মনে হয় গীর্জাগুলো সোনা রূপোয় ভর্ত্তি, সোনা রূপো তো আর যীশুর

লাগেনা। গীর্জার পাত্রীরা ধনী, ওরা গরীবদেরকে পছন্দ করেন না। ওদের মধ্য দিয়ে, ওই সোনারূপোর মধ্য দিয়ে গরীব লোকেরা তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা ঈশ্বরের পৌছে দিতে পারে না। তার মনে পড়ে, তার ছেলে পাভেলও গীর্জায় যেতো না। কিন্তু বাড়ীতে যীশুর একটা মূর্তি এনে রেখেছিল। তিনি শুনেছেন যীশু সাধারণ লোকই ছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করতে।

সেদিন আইভানোভিচের ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। মা ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠেন। ফিরে এসে আইভানোভিচ জানালো, জেলে জেলে নাকি ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছে···সেই খবরের জন্যই তার রাত হয়ে গেল।

গণ্ডগোলের কথায় মার মুখ শুকিয়ে যায়।

আইভানোভিচ বলে,—'শুনলুম, গণ্ডগোলের সুযোগে একজন নাকি পালিয়ে গিয়েছে···চার দিকে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে। কে যে পালালে, তা জানতে পারলাম না।'

উত্তেজনায় মার শীর্ণ দেহ কাঁপতে থাকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলেন,—'পাভেল নাকি?'

—'তা বলতে পারিনা···তবে তার খোঁজ করতে হবে···তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে তো! সেইজন্য আড্ডায় আড্ডায় খবর দিয়ে এসেছি,···আবার বেরুতে হবে···আপনাকে শুধু এই খবরটা দিতে এলাম··'

—'আমি কি সঙ্গে যাব।' মা বলেন।

—'আমার সঙ্গে না এসে আপনি বরঞ্চ এক্ষুনি একবার ইয়াগরের কাছে যান, তাকে খবরটা দিয়ে আসুন।'

যদি পুত্রের খবর পাওয়া যায় সেই আশায় মা তৎক্ষণাৎ সেই গভীর রাত্রের নির্জন পথে বেরিয়ে পড়লেন। আজ তার মনে ভয় নেই।

ইয়াগরের বাড়ীর দরজায় যখন গিয়ে পৌছলেন, তখন উত্তেজনায়

তাঁর শরীর এত কাঁপছিল যে তিনি আর দাঁড়াতে পারছিলেন না। এমন সময় দেখেন, অন্ধকারে কে যেন তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। মা উঠে দাঁড়ান, সামনে চেয়ে দেখেন, নিকোলে, মুখভরা সেই বসন্তের দাগ! তাহলে পাভেল নয়—পালিয়ে এসেছে নিকোলে।

চাপা গলায় মা ডাকেন,—'নিকোলে'।

নিকোলে হাতের ইঙ্গিতে জানায়, বাড়ীর ভেতরে ইয়াগরকে খবর দিন।

ভেতরে ঢুকে দেখেন ইয়াগর বিছানায় শুয়ে আছে, উত্থানশক্তি রহিত।

মা চাপা গলায় বলেন,—'নিকোলে এসেছে!'

—'আমার উঠবার ক্ষমতা নেই···তাকে নিয়ে আসুন!'

নিকোলেকে নিয়ে মা ঘরে ঢোকেন। কনুয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে ইয়াগর হেসে বলে,—'আসতে আজ্ঞা হোক মহাপ্রভুর!'

মা অবাক হয়ে নিকোলেকে জিজ্ঞাসা করেন,—'জেল থেকে পালালে কি করে?'

—'কোন পরিকল্পনা করে পালাই নি, হঠাৎ ঘটে গেল! কয়েদীদের সঙ্গে ওয়ার্ডারদের মারামারি লেগে গেল, সেই অবকাশে ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

ইয়াগরের দিকে চেয়ে নিকোলে বলে,—'ইস্, তুমি দেখছি বড্ডই কাহিল হয়ে পড়েছ?'

—'আমার জন্যে ভাবতে হবে না···এখন বল পাভেল কেমন আছে?'

—'বেশ ভাল আছে। জেলেও বেশ প্রতিপত্তি করে নিয়েছে··· রীতিমত হুকুম চালায়···আমাদের হয়ে কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে···'

ইয়াগর চিন্তিত হয়ে বলে,—'আমিতো শুয়ে···তোমার লুকিয়ে থাকবার ব্যবস্থা···এই সময় সোফিয়া থাকলে বড় ভাল হতো। এ কাজে সে ওস্তাদ!'

মা নিজে সে-ভার নিলেন, নিকোলে পোষাক বদলে ফেললো।

মার ওপর ভার পড়লো, শহরের সীমানা পর্যন্ত নিকোলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার।

যাবার সময় ইগ্নাগর সাবধান করে দেয়,—'চারিদিকে গুপ্তচর··· হুঁসিয়ার হয়ে যাবেন! বিদায়!'

মা গম্ভীর ভাবে বলেন,—'সে আমি জানি। কিন্তু শরীর দেখছি তোমার মোটেই ভাল নয়, একটু সাবধানে থেকো বাছা!'

মা নিকোলেকে শহরের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

এর কয়েকদিন পরে। আইভানোভিচ আর সোফিয়া দুজনে বসে গল্প করছে। এমন সময় ঝড়ের মতন শাশাঙ্কা এসে উপস্থিত। তার মুখ-চোখ যেন উত্তেজনায় জ্বলছে। যে শাশাঙ্কাকে কোনদিন কেউ দু'টোর বেশী কথা বলতে শোনেনি, সর্বদাই স্থির গম্ভীর, আজ হঠাৎ তার এই ভঙ্গী দেখে আইভানোভিচ আর সোফিয়া দুজনেই অবাক হয়ে গেল।

শাশাঙ্কার সেই উল্লসিত মুখ-চোখের ভঙ্গী দেখে সোফিয়া বলে উঠলো,—'কি ব্যাপাররে শাশাঙ্কা! মনে হচ্ছে যেন তুই সাত রাজার ধন খুঁজে পেয়েছিস?'

উত্তেজিত কণ্ঠে শাশাঙ্কা বলে,—'হাঁ, তাই-ই পেয়েছি···যেখানে মনে করতাম আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নেই, সেখানে হঠাৎ দেখতে পেয়েছি পরম ধন··নিকোলেকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারতাম না···মনে করতাম ও মনুষ্যত্বের বাইরে। কাল সারারাত ও-র সঙ্গে কথা বলেছি,··ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। কাল যে ছিল পথের ধারে নুড়ির মতন, আজ কি করে তার ভেতরে জেগে উঠলো প্রাণের পাগলা ঝোরা! নিজের কথা ও ভাবতে যেন ভুলে গিয়েছে, কাল সারারাত ধরে শুধু বলেছে, এখনো যে-সব বন্ধু জেলে বন্দী হয়ে আছে, কি করে তাদের উদ্ধার করা যায়। যেমন করে পারে, সে তাদের মুক্ত করবেই।'

রান্নাঘর থেকে শাশাঙ্কার কথা শুনে মার বুক দুলে ওঠে, মা বুঝতে পারেন, শাশাঙ্কা কার মুক্তির আশায় এত উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

শাশাঙ্কা উত্তেজিত হয়ে বলে,—'নিকোলের প্রস্তাবে আমাদের

সকলের সাহায্য করা উচিত।'

সোফিয়া হেসে ওঠে। শাশাঙ্কা হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়ে। নিজের লজ্জাকে জোর করে চেপে সে বলে ওঠে,—'আমি বুঝতে পেরেছি আমার উত্তেজনা দেখে কেন তোমরা হাসছো? তোমরা ভেবেছ, আমি বিশেষ কারুর জন্যে ব্যক্তিগত কারনে এত উত্তেজিত হয়েছি, তাই না?'

সোফিয়া উঠে শাশাঙ্কাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে,—'তাই যদি হয়, তাতেই বা দোষ কি?'

শাশাঙ্কা লজ্জায় ক্ষেপে ওঠে,—'বেশ' তাই যদি তোমাদের ধারণা হয়, তাহলে এসম্বন্ধে আমি আর কোন কথা বলতে চাইনা···কখনো বলবো না আর।'

মা ছুটে এসে অভিমানিনী শাশাঙ্কাকে বুকে টেনে নেন। তিনি বুঝতে পারেন, আজ তাঁরই মত, এই নির্বাক লাজুক মেয়েটির মন তাঁর ছেলের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

আইভানোভিচ ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলে,—যদি জেল থেকে বার করে আনবার বন্দোবস্ত ঠিক মত করা সম্ভব হয়, তাহলে সে-সম্বন্ধে আর কোন দ্বিমত থাকতে পারে না—এখুনিই আমাদের তা করা উচিত···কিন্তু একটা কথা আছে, যাদের জন্যে এ-ব্যবস্থা হবে, তারা তাতে রাজী আছে কিনা, সেটা আগে জানতে হবে। শাশাঙ্কা তুমি ব্যবস্থা কর, কালই আমি একবার নিকোলের সঙ্গে দেখা করবো।'

শাশাঙ্কা বলে,—'বেশ, আমি কালই জানিয়ে যাবো, কোথায় কখন তার সঙ্গে দেখা হবে।'

সোফিয়া জিজ্ঞাসা করে,—'নিকোলে এখন আছে কোথায়?'

শাশাঙ্কা বলে,—'সরকারী বনের যে মালী, বনের ভেতর তার ঘরেই সে লুকিয়ে আছে।'

মা চায়ের বাসন পরিষ্কার করছিলেন। আইভানোভিচ তাঁর কাছে গিয়ে বলে,—'মা আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। পরশুদিন আপনি পাভেলের সঙ্গে জেলে দেখা করতে যান, দেখা করবার সময় লুকিয়ে তার হাতে একটা চিঠি কিন্তু দিয়ে আসতে হবে, পারবেন তো?'

মা উল্লাসিত হয়ে ওঠেন। বলেন,—'নিশ্চয়ই পারবো!'

স্বাভাবিক ম্লান গম্ভীর মুখে শাশাঙ্কা বিদায় নিয়ে চলে যায়। আসবার সময় তার মুখে উত্তেজনার যে-প্রদীপ জ্বলছিল, তা যেন সে নিজের হাতে আবার নিভিয়ে দেয়।

শাশাঙ্কা চলে গেলে সোফিয়া মার কাছে গিয়ে হেসে বলে,—'এই রকম একটি মেয়ে যদি আপনার বৌ হয়ে ঘরে আসে··'

সেই অসম্ভব সুখের আশায় মার চোখ অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। কান্নায় ভেঙ্গে-পড়া গলায় বলেন,—'একদিনের জন্যেও যেন ওদের দুজনকে এক জায়গায় দেখে যেতে পারি!'

পরের দিন বিকেলবেলা আইভানোভিচের কাছে মা শুনলেন, ইয়াগর মারা গিয়েছে। ইয়াগরকে শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে সেই দিনই তার দিন ফুরিয়ে যায়। সারা জীবনের ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর নির্য্যাতনের শেষ।

আইভানোভিচ আড়ালে থেকে বিপ্লব-বন্ধুর অন্তিম সংকারের ব্যবস্থা করে। সকালবেলা একদল মলিন-বেশ যুবক হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে ইয়াগরের শবদেহকে নিয়ে কফিনে শুইয়ে দিল। কফিনের ওপর তারা বিছিয়ে দিল, তাদের দলের চিহ্ন স্বরূপ, লাল রিবনের শেষ অর্ঘ্য।

গুপ্তচরেরা জানতো, ইয়াগরের শবদেহ সমাহিত করবার জন্যে নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের লোকেরা আসবে, তাই তারা ভোর থেকেই শাদা পোষাকে হাসপাতালের দরজার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল··· তাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, হয়ত এই ভিড়ে তাদের দেখতে পাওয়া যাবে। ভিড়ের একধারে মা-ও নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন।

লাল-রিবন-দিয়ে মোড়া সেই শবাধার কয়েকজন বিপ্লবী নীরবে কাঁধে তুলে নেয়। এমন সময় ভারী বুটের আওয়াজে সকলে সচকিত হয়ে উঠলো। দেখলো একদল সশস্ত্র সৈনিককে নিয়ে পুলিস-অফিসার এসেছে। ভিড় ঠেলে পুলিশ-অফিসার শবাধারের কাছে গিয়ে হুকুম



দেয়,—'খুলে ফেল, ঐ লাল রিবন !'

পুলিশের হুকুমে জনতা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে। মার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ছেঁড়া-পোষাকে একজন শ্রমিক। তার কানে কানে মা বললেন,—'দেখতো বাছা, একি অন্যায় ? আমার খুশীমত আমার আত্মীয়কে গোর দিতে দেবে না ?'

অফিসারের হুকুমে কর্ণপাত না করে শববাহীরা কফিন কাঁধে দু'পা এগুতেই পুলিশ অফিসার গর্জন করে উঠলো, -'এই মুহূর্তে রিবন খুলে নে, বলছি !'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠলো,—'শান্তিতে আমাদের মরতেও দেবে না ব্যাটারা !'

পুলিশ অফিসার ঘাড় তুলে দেখতে চেষ্টা করে, কার এতবড় আস্পর্দ্ধা ? কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কাউকেই সনাক্ত করা গেল না !

রাগে তিনি একজন সৈনিককে হুকুম দিলেন,—'তলোয়ার দিয়ে রিবনগুলো ছিঁড়ে ফেলো !'

খাপ থেকে তলোয়ার খোলার শব্দ হলো। ভয়ে মা চোখ বুঁজে ফেল্লেন। তাঁর মনে হলো, এখনি ক্ষিপ্ত জনতার সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ বাধবে। সেই বীভৎস দৃশ্যের জন্যে মা চোখ বুঁজে নিজেকে তৈরী করে নিলেন। তারপর চোখ খুলে দেখেন, যে সেখানে ছিল, সে ঠিক সেইখানেই আছে···কেউ একটা কথা পর্যন্ত প্রতিবাদে বলে নি ···কফিনের ওপর শুধু লাল রিবনগুলো নেই।

শববাহীরা নীরবে নতমস্তকে এগিয়ে চলে। সমস্ত অপমান, লাঞ্ছনা হজম করে জনতাও নতমস্তকে এগিয়ে চলে। দু'পাশে চলে সৈনিকেরা। ফুটপাথ ধরে মা-ও নতমস্তকে এগিয়ে চলেন।

গোরস্থানে এসে পৌঁছতেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে গম্ভীর নির্লিপ্ত কণ্ঠে শববাহীদের জানিয়ে দেয়,—'ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী সমাধির সময় কোন বক্তৃতা কেউ দিতে পারবে না !'

নীরবে তারা মাটি খুঁড়ে শবাধার নামিয়ে দেয়। মা নির্বাক হয়ে ভাবেন, এ কেমন সমাধি, কোন পুরোহিত নেই, নেই কোন প্রার্থনা !

কবরে মাটি দেবার সময় একজন যুবক এগিয়ে এসে বলে,—'আমি কোন বক্তৃতা দিতে চাই না···পুলিশের বারণ—যে বন্ধু আমাদের পথ দেখাতে গিয়ে অনশনে প্রাণ দিল, আজ তার কবরে দাঁড়িয়ে শুধু এই প্রতিজ্ঞা করি,—যাদের নিপীড়ন অত্যাচারে আজ আমাদের বন্ধু কবরে শুলো, আমরা যেন তাদের কবর খুঁড়ে যেতে পারি!'

পুলিশ অফিসার গর্জন করে ওঠে,—'গ্রেফ্‌তার করো!'

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক ওই যুবককে ঘিরে দাঁড়ায়। তাকে ধরতে হলে, সব লোককেই ধরতে হয়।

মার ধারণা হলো, এখুনি হয়ত শুরু হয়ে যাবে রক্তারক্তি। ভয়ে আপনা থেকে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যায়। কানে আসে, পুলিসের বাঁশীর আওয়াজ, সেইসঙ্গে চারদিকে চীৎকার আর ছোটাছুটির শব্দ, মেয়েদের আর্তনাদ।

সেই গোলমালের ভেতর থেকে মা শুনতে পেলেন সেই যুবক গম্ভীর-কণ্ঠে বলছে,—'বন্ধুরা এইরকম ভাবে চেঁচামেচি করো না··· বিপদের সময় কি রকম ব্যবহার করতে হয়, তা আজও শিখলে না তোমরা··· আমাকে বাধা দিও না···'

মা চোখ চেয়ে দেখতেই, তাঁর চোখের সামনে ঝলসে উঠলো ঝিক-মিক করা পুলিসদের সঙ্গীনের ডগা।

মা দেখলেন, একদল ছেলে সামনের বাগানের বেড়া ভেঙ্গে লাঠি নিয়ে পুলিসদের সঙ্গে মারামারি করবার জন্যে তৈরী হয়েছে। তাদের দিকে চেয়ে ঐ যুবক ভর্ৎসনা করে উঠলো,—'অযথা শক্তি ক্ষয় করো না··· নামাও লাঠি।'

মা দেখলেন, আইভানোভিচও ক্ষিপ্ত যুবকদের বুঝিয়ে বলছে,—'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে···বেয়নেটের সামনে এই পচা লাঠি!'

আইভানোভিচের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতেই মার নজরে পড়লো, তার একটা হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লাল হয়ে গিয়েছে, রক্ত ঝরে পড়ছে। অথচ সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। তাড়াতাড়ি তার

হাতধরে টানতে টানতে মা বলেন,—'চল, বাড়ী চল এখ্খুনি!'

এই বলে মা পা বাড়াতেই আইভানোভিচ চিৎকার করে ওঠে,—'কি করছেন, আর এগুবেন না…এগুলেই ওরা গুলি করবে!'

মা থমকে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়েন। কিন্তু যত বুঝতে চেষ্টা করেন, ততই যেন সব গোলমেলে হয়ে ওঠে। ভয়ে, নিরুদ্ধ আবেগে তিনি থরথর করে কাঁপতে থাকেন। সোফিয়া মার অবস্থা বুঝতে পারে। তক্ষুনি ছুটে এসে মার সমস্ত দেহটা নিজের দেহের ওপর টেনে নেয় একহাতে, অপর হাতে তখন একটি কিশোর বালককে সে টেনে ধরে ছিল। ছেলেটিও ক্ষত-বিক্ষত। সোফিয়ার হাত থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টায় সেই বালক আইভান চীৎকার করে ওঠে,—'ছেড়ে দিন আমাকে…'

মার কানে কানে সোফিয়া বলে,—'এখনো পুলিশের লোকেরা আপনাকে চিনতে পারেনি…এই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে শিগ্গির বাড়ী চলে যান…নইলে এখুনি গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন…যান…আর একমুহূর্ত্তও দেরী করবেন না…'

আহত আইভানকে সঙ্গে নিয়ে মা যখন বাড়ী ফিরলেন, তখন দেখেন তার আগেই সোফিয়া ডাক্তারকে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আইভানের চিকিৎসা করে ডাক্তার সেদিনের মত তাকে সেইখানেই শুয়ে থাকতে বলল। মার সমস্ত পোষাক রক্তে ভরে গিয়েছিল। পোষাক বদলাতে বদলাতে মা শুনতে পেলেন, সোফিয়া আর আইভানোভিচ কথা বলছে…তাদের কথার মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই…যেন ঘটনাটা অতি সামান্য, অতি সাধারণ। মা অবাক হয়ে যান, এত বড় একটা ঘটনা, অথচ তারা বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হয়নি…এই পুলিশ, সৈন্য, বেয়নেট, রক্তারক্তি তাদের এতটুকুও বিচলিত করে নি। রক্তাক্ত অত্যাচারের সঙ্গে এই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়ে, সোফিয়া আর আইভানোভিচের দিকে চেয়ে, মার মনে জেগে ওঠে এক বিচিত্র অনুপ্রেরণা। এইমাত্র যে ঘটনা ঘটে গেল, সে সম্বন্ধে তারা কোন কথাই বললো না, যেন তা ঘটেনি, তারা আলোচনা করছে, কাল

সকালে কোথায় কিভাবে কাজ আরম্ভ করবে।

মা শুনছেন আইভানোভিচ দুঃখ করে বলছে,—'আমাদের এতদিনের চেষ্টার ফলে এখন সাধারণ লোকের মন যেন একটু নড়েছে নানা জায়গা থেকে আবেদন আসছে বই পাঠাও, কাগজ পাঠাও, কিন্তু আমরাই পাঠাতে পারছি না…এতদিনে একটা ভাল প্রেস জোগাড় করতে পারলাম না…একা লুডামিলা ভাঙ্গা প্রেস আর ভাঙ্গা টাইপ নিয়ে কতদিন খেটে মরছে! অন্তত তাকে সাহায্য করবার একজন লোক চাই-ই · নইলে সে-ও বিছানা নিলো বলে।'

সোফিয়া নিকোলের নাম প্রস্তাব করে · আইভানোভিচ বলে,—'না, ওকে এখন শহরে রাখা চলবে না…'

শান্তকণ্ঠে মা বলেন,—'আমাকে দিয়ে কি সে কাজ হতে পারে?'

আইভানোভিচ বুঝতে পারে মার অন্তর আজ কাজ করবার জন্যে কিরকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। পাছে তিনি আঘাত পান তাই আইভানোভিচ সে-প্রস্তাবটি ঘুরিয়ে বললো,—'আমরা একটা নতুন ছাপাখানা করছি ··আপনাকে সেখানে দেখাশোনা করার ভার দেবো ঠিক করেছি।'

মা আজ বুঝতে পারেন একথার কি অর্থ! সত্যিকারের কোন কাজ করবার মত শিক্ষা তাঁর নেই, এসব কাজে যতখানি লেখাপড়া জানা দরকার, তা তিনি জানেন না…অন্তর থেকে আপনা হতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ম্লান হেসে মা বলেন—'দেখাশোনা করা মানে তো রান্নাবান্না করা! তা, তাই না হয় করবো।'

ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে আইভানোভিচ বলে,—'মা এখন আপনার সব চেয়ে বড় কাজ হলো, জেলে পাভেলের সঙ্গে দেখা করা এবং লুকিয়ে তার হাতে একটা চিঠি দেওয়া…পাভেল আর লিটিল রাশিয়ান যদি জেলের ভেতর আটক থাকে, তাহলে আমাদের কাজ কিছুতেই এগোবে না! কবে যে তাদের বিচার হবে তার ঠিক নেই… যেমন করে হোক, তাদের জেলের বাইরে আনতেই হবে।'

মা আবার উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, বলেন,—'সব জায়গায় পুলিশ

...পাভেলের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন দেখা করতে যাই...কিন্তু একটা কথাও বলতে পারি না...মাঝখানে সঙ্গীন হাতে পুলিশ থাকে দাঁড়িয়ে! ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে পাভেলের মুখের দিকে চেয়ে চলে আসি।'

মা মনে মনে স্থির করেন, থাকুক পুলিশ, এবার কথা তিনি বলবেনই।

পরের দিন দুপুর বেলা জেলের ভেতর একটা কুঠরীতে মা বসে আছেন। সামনেই লোহার গরাদের খাঁচা, সেই খাঁচার ভেতর থেকে হবে পাভেলের সঙ্গে দেখাশোনা।

পাভেল এসে দাঁড়াতে, মা নীরবে তার দিকে চেয়ে থাকেন, দেখেন একমুখ দাড়ি আর গোঁফে সেই অতি পরিচিত মুখ কি রকম যেন বদলে গিয়েছে। মা সুযোগ খোঁজেন, কখন পাভেলের হাতে চিঠিটা গুঁজে দিতে পারবেন।

পাভেলই প্রথমে কথা বলে,—'আমার জন্যে আর ভাবছো না তো? এইতো আমি বেশ ভালই আছি।'

তারপর গলা নীচু করে বলে,—'তুমি কেমন আছ?'

'ভালই আছি...ইয়াগর মারা গেল'—একান্ত নিস্পৃহভাবে মা কথাগুলো উচ্চারণ করেন।

পাভেল চমকে ওঠে,—'সত্যি?'

সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা নীচু হয়ে যায়। যেন নীরবে প্রার্থনা করে।

মা তেমনি নিস্পৃহভাবে বলেন,—'কবর দেবার সময় পুলিশ হাঙ্গামা বাধায়...দু'একজনকে গ্রেফতার করে, মারামারি হয়...'

পুলিশের লোক জিভ কেটে লাফিয়ে ওঠে, ধমক দিয়ে বলে,—'এসব কি হচ্ছে? রাজনীতির কথা এখানে একদম বলা চলবে না!'

মা দাঁড়িয়ে উঠে বোকা গ্রাম্য রমনীর মতন বলেন,—'না বাবা, রাজনীতির কথা বলবো কেন? আমি বলছিলাম আমাদের ওখানে একটা ঝগড়া কাজিয়া হয়েছিল...একজনের মাথা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়...আহা বেচারা!'

পুলিশ ধমক দিয়ে ওঠে,—'কোন কথা বলতে পারবি না। তোদের জন্যে আমি জবাবদিহি করবো না?'



এই বলে পুলিশের অফিসারটি পেছন ফিরে তার বসবার জায়গায় কাগজ পত্র ঠিক করে রাখতে গেল···সেই অবকাশে মা তাড়াতাড়ি ছোট কাগজটা পাভেলের হাতে গুঁজে দিলেন।

পুলিশ ফিরে চাইতেই মা ভালোমানুষের মতন জিজ্ঞাসা করেন,—'তোর শরীর ভালো আছে তো?'

পুলিশ ঘাড় নেড়ে বলে,—'হ্যাঁ, এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে পার।'

মা একান্ত নিষ্প্রয়োজন ঘরসংসারের কথা বলেন। হঠাৎ পাভেলের দিকে চেয়ে বলে উঠেন,—'তোর সেই ধর্ম ছেলে···তার সঙ্গে সেদিন দেখা হোলো···'

পাভেল অবাক হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে মা মা কার কথা বলছেন?

মা চোখের ইঙ্গিতে আঙুল দিয়ে মুখে বসন্তের দাগ দেখিয়ে বলেন,—'ঐযেরে দুষ্ট ছেলেটা…মুখে বসন্তের দাগ!'

—'ও!' পাভেল বুঝতে পারে…মা নিকোলের কথা বলছেন।

এই সামান্য কথা থেকে পাভেল বুঝতে পারে মা দলের কাজে কতখানি এগিয়ে এসেছেন!

মা বলেন,—'যাই হোক্, এখন ভালই আছে…একটা নতুন কাজেরও জোগাড় হয়েছে!'

নিজের আনন্দ চেপে পাভেল বলে,—'তা ভাল!'

বিদায়ের সময় মার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে পাভেল বলে,—'ধন্যবাদ মা!'

ছেলের কণ্ঠস্বর থেকে মা বুঝতে পারেন, এতদিন পরে তাঁর ছেলের কাছে যে তিনি সত্যই আসতে পেরেছেন, সে-কথা তাঁর ছেলে বুঝতে পেরেছে। আনন্দে মার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বাড়ী ফিরে দেখেন, শাশাঙ্কা বসে আছে। মা লক্ষ্য করে-দেখেছেন, যেদিনই তিনি পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে যান, সেইদিনই শাশাঙ্কা তাঁদের বাড়ীতে আসে। চুপটী করে বসে থাকে। পাভেল সম্বন্ধে মা যদি নিজে কোনো কথা না তোলেন, তাহলে সে কোন কথাই উত্থাপন করেনা। শুধু নীরবে, মার চোখের দিকে চেয়ে থাকে; বুঝতে চেষ্টা করে চোখের নীরব ভাষা।

শাশাঙ্কা আজ কিন্তু নিজেই জিজ্ঞাসা করে,—'দেখতে গিয়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ, ভালই আছে…'

—'চিঠিটা দিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ!'

—'আপনার কি মনে হয় আমাদের প্রস্তাবে সে নিশ্চয়ই রাজী হবে?'

—'কি করে বলবো মা! জানো তো তাকে,…নিজেকে ছাড়া সে আর কাউকেই মানতে চায় না!'

আপনা থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস শাশাঙ্কার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে। মা আদর করে শাশাঙ্কাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। নীরবে দুটি

নারীর চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

নিজেকে সামলে নিয়ে শাশাঙ্কা সেই আহত ছেলেটার কথা তোলে।

—'মাথায় খুব জোর আঘাত লেগেছে···মাথার গোলমাল না হয়ে যায়···বড় দুর্বল, একটা কিছু খেতে দেওয়া দরকার···'

মা তাড়াতাড়ি করে কিছু খাবার সংগ্রহ করে আহত আইভানের কাছে নিয়ে আসেন। শাশাঙ্কার সামনে আইভান কেমন সংকুচিত বোধ করে। শাশাঙ্কা বুঝতে পেরে সেখান থেকে সরে যায়।

খাওয়াতে খাওয়াতে মা জিজ্ঞাসা করেন,—'হাঁ বাছা, তোমার বয়স কত?'

—'সতেরো!'

—'বাপ-মা কোথায় থাকেন?'

—'গ্রামে··আমার যখন দশবছর বয়স, আমি তখন বাড়ী ছেড়ে চলে আসি··'

মা আজ একথায় আর অবাক হন না।

হঠাৎ সেই কিশোর বালক দলের রীতি অনুযায়ী মাকে কমরেড বলে সম্বোধন করে বলে,—'কমরেড, আপনার নামটি···জানতে পারি কি?'



হঠাৎ সেই কমরেড ডাকে মার মন আনন্দে আর গর্বে দুলে ওঠে, হেসে বলেন,—'আমার নাম জেনে তোমার কি হবে ?'

—'কেন জিজ্ঞাসা করছি জানেন, আমি যে-দলে কাজ করি, সেখানে কমরেড পাভেলের মার কথা শুনতাম…তিনি নাকি মে দিবসের উৎসবে দলের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন…আপনারই মতন বয়স তার…শুনেছি অদ্ভুত ভাল লোক তিনি।'

সেই কিশোর বালকের মুখে এই ভাবে নিজের প্রশংসা শুনে, মা ছোট মেয়ের মতন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন, কিন্তু এইভাবে নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের প্রশংসা শুনতেও নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করেন।

এমন সময় সোফিয়া এসে উপস্থিত হয়…হেমন্তের এক ঝলক রোদের মতন।

এসেই মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—'জানেন, নতুন বিয়ে করে বড়লোক বুড়োরা যেমন নতুন বৌ-কে অষ্টপ্রহর চোখে রাখতে চেষ্টা করে, গুপ্তচরেরা আজকাল আমাকে ঠিক সেই রকম চোখে চোখে রেখেছে… নড়বার চড়বার উপায় নেই…এখান থেকে এবার সরে পড়তে হবে!'

তারপর মাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলে,—'আবার সেই গাঁয়ে যেতে হবে,…সারা দিনরাত খেটে লুডামিলা প্রায় তিনশো বই তৈরী করে ফেলেছে…মরবে, এবার ওটা খেটে খেটে মরবে!'

মা উৎসাহিত হয়ে,—'আমি তৈরী, বল কখন যেতে হবে ?'

—'কালই রওনা হতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু সেবার যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলাম, এবার আর সে-পথ দিয়ে যাওয়া চলবে না…ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গোয়েন্দারা ঘুরছে…আর একটা পথ আছে একটু ঘুরে…সে পথে কিন্তু হেঁটে যাওয়া যাবে না, ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে…পথে তিনবার ঘোড়া বদল করতে হবে…পারবেন তো ?'

—'নিশ্চয়ই!'

—'আর একটা কথা…শুনলাম, সেখানে ধরপাকড় শুরু হয়ে গিয়েছে, আপনার ভয় করবে না তো ?'

সোফিয়ার প্রশ্নে মা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নিজের পুরোনো জীবনের জন্যে লজ্জিত হয়ে বলেন,—'আমি আর কিসের জন্যে ভয় পাবো বাছা? আমার ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল আমার ছেলে! তার জন্যেইত এ পোড়া মন রাতদিন ভয়ে কাঁপতো, তা সে নিজেই আজ আমার সমস্ত ভয় ভেঙ্গে দিয়েছে···এখন আমার আর কিসের ভয়।'

মা যে এতদূর ব্যথিত হয়ে উঠবেন তা সোফিয়া বুঝতে পারে নি। তাই লজ্জিত হয়ে বলে,—'আমার উপর কি রাগ করলেন?'

—'না বাছা না, রাগ করবো কেন? তবে আমার একটা কথা, এ রকম করে দলের মধ্যে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করো না, বড় কষ্ট হয়।'

মার হাত দুটো ধরে অপরাধীর মতন সোফিয়া বলে,—'আপনি দেখবেন, এ অপরাধ আমি আর কখনো করবো না!'

ঠিক হলো, মা একাই যাবেন এবার!

পরের দিন ভোর না হতেই মা ঘোড়ার গাড়ী করে বেরিয়ে পড়লেন। বিকেলের দিকে নিকোলস্ক্ গ্রামে এসে গাড়ী থেকে নামলেন। খোঁজ করে গাঁয়ের সরাইখানায় গিয়ে উঠলেন।

সরাইখানার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেন, বাইরে কিছু দূরে একদল লোক মিলে চেঁচামিচি করছে···আর একজন পুলিশ সার্জেন্ট ঘোড়ায় চড়ে সেই দিকে ছুটে যাচ্ছে।

একটা ছোট মেয়ে চা নিয়ে আসতে মা তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি ব্যাপার হয়েছে মা ওখানে?'

চায়ের কাপ রেখে মেয়েটি বলে,—'একটা চোর নাকি ধরা পড়েছে···'

—'চোর? কি রকম চোর?'

—'তা আমি কি করে জানবো?'

—'কি চুরি করেছে সে?'

—'বারে, আমি তা কেমন করে জানবো? ওরা বলাবলি করছে—

শুনলাম, একটা চোর নাকি ধরা পড়েছে!'

সরাইখানার সামনেই একটা ছোট বাড়ী, মা জানালা থেকে দেখেন, সমস্ত লোক সেই বাড়ীটার দিকেই আসছে। আর ক্রমশ ভিড় বেড়ে উঠছে। মা খবর নিয়ে জানলেন, সরাইখানার সামনে ঐ বাড়ীটাই নাকি এখানকার টাউনহল।

চা খেয়ে মা তাড়াতাড়ি সরাইখানা থেকে বেরিয়ে টাউন হলের দিকে এগিয়ে চলেন। হলের কাছাকাছি আসতেই চারদিক থেকে জনতা ভেঙ্গে পড়লো। জনতার ভেতরে চেয়ে দেখতেই, মা পাথর হয়ে গেলেন। দেখেন, যার জন্যে তিনি যাচ্ছেন, সেই রাইবিনকে পুলিশ পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসছে।

বহু কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে মা ঘাড় উঁচু করে দাঁড়ালেন। সামনে দিয়েই রাইবিন চলে গেল। একবার রাইবিনের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো···শুধু ঠোঁট নেড়ে মাকে লক্ষ্য করে সে যেন কি বল্লো, মা বুঝতে পারলেন না।

মা পাশের একজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করেন,—'কি হয়েছে বাছা?'

লোকটি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো,—'যা হচ্ছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছো!'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো,—'উঃ চোর, না ডাকাত! কি ভয়ঙ্কর চেহারা!'

হঠাৎ রাইবিন সেই অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ালো, জনতাকে শুনিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো,—'শোন সবাই। আমি চোর নই! আমি কারুর কিছু চুরি করি নি। আমার অপরাধ, যারা আমার তোমার সবার সর্বস্ব চুরি করছে, তাদের পাপের কথা, তাদের অনাচারের কথা যে সব বইতে লেখে, আমি সেই সব বই লোকের কাছে পৌঁছে দিই। এই আমার অপরাধ।'

রাইবিনের সেই ভয়লেশহীন ভঙ্গী মার মনে নতুন শক্তি এনে দিলো। চারদিকে লোকের ভিড়, অধিকাংশই চাষী! তাদের মুখের দিকে মা চেয়ে দেখেন, সকলেই ভয়ে নির্বাক···প্রত্যেকের মুখে ভয়ের

স্পষ্ট ছাপ।

আবার রাইবিন চীৎকার করে ওঠে,—'বন্ধুগণ, তোমরা সেই সব বই পড়ে দেখো, তার প্রত্যেকটি কথা সত্যি···আমিও তোমাদের মতন একজন গরীব চাষী। আমাদের দুঃখের কথাই তাতে লেখা আছে··· আর লেখা আছে, কি করে আমরা···'

এমন সময় পুলিসের বড় কর্তা এসে উপস্থিত হলো, রাইবিনের দিকে চেয়ে গর্জে উঠলো,—'কি বকছে ঐ কুকুরটা ?'

পুলিশের এক সার্জেন্ট রাইবিনের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে এনে কর্তার সামনে ফেলে দেয়।

রাইবিন সেই অবস্থায় তেমনি চীৎকার করে বলে,—'তোমরা চোখের সামনেই তো দেখলে কারা অন্যায় করে···'

সার্জেন্ট হাতের লাঠিটা নিয়ে সজোরে রাইবিনের মুখের ওপর আঘাত করে। রাইবিনের হাত পেছন দিকে বাঁধা, টাল সামলাতে না পেরে সে ঘুরে পড়ে যায়।

—'সবাই দেখো, হাত বেঁধে ওরা কিরকম করে নির্যাতন করে !

রাগে সার্জেন্ট নির্মমভাবে রাইবিনের সারা দেহে প্রহার করতে সুরু করে দেয়।

ভিড়ের ভেতর থেকে এবার একজন ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো—'আহা, এরকম করে মারা উচিত হচ্ছে না !'

পুলিশের কর্তা জনতার দিকে চেয়ে হুকুম দেয়,—'হটাও এই ভিড়কে !'

রাইবিন চীৎকার করে বলতে থাকে,—'যতই মার, যতই আঘাত কর, সত্যকে তোমরা মেরে চুপ করাতে পারবে না! অত্যাচারীরা একদিন নিশ্চিহ্ন হবে, সত্যের জয় হবেই।'

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় আবার সেই নির্দ্দয় প্রহার।

সেই দৃশ্য ক্রমশ ভীরু জনতাকেও উদ্বেল করে তুল্লো। একজন লোক সাহস করে এগিয়ে এসে পুলিসের কর্তাকে বলে,—'হুজুর লোকটা যদি দোষ করে থাকে, ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিচার করুন,

এরকম করে রাস্তায় ফেলে হাত বেঁধে মারবেন না হুজুর। এটাত স্তায় কাজ নয়।'

তখনও রাইবিনের কপাল ফেটে রক্ত মুখ বেয়ে ঝরে পড়ছিল।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন চাষী চুপিচুপি রাইবিনের কানে বোধহয় কোন সান্ত্বনার কথা বল্লো।

তার উত্তরে রাইবিন অবিচলিত চিত্তে বলে উঠলো,—'না ভাই, আমি কোন দুঃখ পাচ্ছি না। কিসের দুঃখ? আমি যে জানি, জগতে আর আমি একলা নই। আমারই মত যারা সারা পৃথিবীতে অন্যায় নিপীড়ণ, অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, লড়াই করছে, আমি যে তাদেরই একজন।

তাদের সেই সত্য-সাধনার মধ্যেই আমি ও আমার মতো আরও যারা অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি তারা বেঁচে থাকবো, সেইত আমাদের চরম আনন্দ!

ভিড় ক্রমশ বেড়ে উঠেছে দেখে, পুলিশ রাইবিনকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে গেল।

জনতা নীরবে যে যার বাড়ীতে মৃদুস্বরে আলোচনা করতে করতে ফিরে যায়। একজন বুড়ো চাষী মার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আপনার মনে সে বলে ওঠে,—'আজকালত মাঝেমাঝেই এইরকম ঘটছে!'

মা তার কথায় সায় দিয়ে বলে ওঠেন,—'তাইতো দেখছি!'

মার জবাবে মার দিকে নজর পড়তেই বুড়ো আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে মাকে বলে,—'আপনাকে তো এ গাঁয়ের লোক বলে মনে হচ্ছে না? কি করা হয় আপনার?'

আজ আর এ জাতীয় প্রশ্নে মা থতমত খেয়ে যান না। স্থির কণ্ঠে জবাব দেন,—'আমি এখানে পশম কিনতে এসেছি!'

—'পশম কিনতে? এখানে? এখানে তো ভাল পশম পাবেন না!'

মার মাথায় হঠাৎ একটা মতলব এলো। বল্লেন,—'ভালোই হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে, নতুন জায়গা বিশেষ কিছুই জানিনা, আজ

রাত্তিরের মতন আপনার ওখানে কি একটু থাকবার জায়গা হবে ?'

বুড়ো স্বচ্ছন্দে বল্লো,—'বেশ তো···কোন আপত্তি নেই, তবে আপনার মতন লোকের সেখানে থাকতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে···নামেই ঘর ···বাসের একেবারে অযোগ্য···'

মা বলেন,—'তাতে কিছু যায় আসে না···ভাল বাড়ীতে থাকা আমারও অভ্যাস নেই···একটু যদি দাঁড়ান, সরাইখানায় আমার একটা ব্যাগ আছে···সেটা নিয়ে আসছি···'

'বেশতো, চলুন···আমিও সঙ্গে যাচ্ছি···'

মা ব্যাগটি নিয়ে এলে, বৃদ্ধ নিজেই সেটা বহন করবার ভার নিলো।

বুড়ো চাষীর ঘরে এসে মা দেখলেন, সামান্য চাষীর ঘর কিন্তু চমৎকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বুড়োর স্ত্রী তাতিয়ানা মাকে আদর করে ভেতরে নিয়ে গেলো।

মার মন কিন্তু সেই ব্যাগের ওপর পড়ে রয়েছে, সেই ব্যাগেতেই আছে আসল মাল, নিষিদ্ধ পুস্তক···ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জেল।

তাই মা জিজ্ঞাসা করলেন,—'আমার ব্যাগটা···'

বুড়ো মৃদু হেসে বলে,—'ভয় নেই, নিরাপদ জায়গাতেই রেখে দিয়েছি। সরাইখানায় ব্যাগটা যখন হাতে নিই···তখন সরাইখানার লোকদের শুনিয়ে বলেছিলাম, ব্যাগটা একদম হাল্কা দেখছি···'

মার বুক দুর দুর করে কাঁপতে থাকে। তবে কি লোকটা পুলিশেরই কোন চর নাকি !

বুড়ো একগাল হেসে বলে,—'ব্যাগটা আসলে কিন্তু রীতিমত ভারী !'

মা ভয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। তাহলে লোকটা কি তার ব্যাগ খুলে দেখেছে ?

বুড়ো আস্তে আস্তে মার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে,— 'লোকটাকে আপনি চেনেন,···না ?'

মা শুষ্ক কণ্ঠে বলেন,—'কোন লোকটাকে ?'

বুড়ো বলে,—'এই মাত্র যে লোকটাকে পুলিশ মারছিল···আমি

দেখলাম, তার সঙ্গে আপনার চোখাচোখি হলো,—হ্যাঁ···একটা মানুষের মতন মানুষ বটে···শক্ত মানুষ···কি মারটাই না খেলো কিন্তু এতটুকুও দমলো না !

মা কি বলবেন, ভেবে ঠিক করতে পারেন না। লোকটা বন্ধু না শত্রু ?

বুড়ো জবাবের প্রতীক্ষা না করে আপনার মনে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ মার সামনে এসে বলে,—'ব্যাগটা হাতে করেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন ? যে-সব নিষিদ্ধ বইএর কথা লোকটা বলছিল, যে সব বইতে অত্যাচার অনাচারের কথা লেখা থাকে, ব্যাগটাতে সেই সব বই-ই আছে···আমি দেখিনি কিন্তু আমার অনুমান সত্যি কি না বলুন ?'

বুড়োর কণ্ঠস্বর, ভঙ্গী আর কথাবার্তা শুনে মার মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না, নিশ্চয়ই লোকটি তাঁদের বন্ধুই হবেন। তার কাছে লুকানোর আর কোন মানেই হয় না। তাই মা বল্লেন,—'হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক···বই নিয়ে এসেছিলাম ও-কে দেবো বলেই !'

এতক্ষণ পরে মার অন্তরের নিরুদ্ধ সব বেদনা সহানুভূতির স্পর্শে ভেঙ্গে পড়লো। রাইবিনের সেই রক্ত-ঝরা মুখের কথা মনে করে মা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লেন।

নীরবে বুড়ো আবার পায়চারি করে।

—'কিছু কিছু বই আমাদের গাঁয়েও এসেছে···আমি নিজে পড়তে জানি না, আমার এক বন্ধু পড়ে শুনিয়েছিল···খাঁটি কথা···একেবারে নিছক সত্যি কথা সব,···আমার স্ত্রী কিছু পড়তে শুনতে জানে, এ ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ !'

মার মনে তখন বইএর কথা কোথায় ভেসে চলে গিয়েছিল। তাঁর স্নেহ কোমল মাতৃ-হৃদয় জুড়ে তখন জেগে ছিল নির্যাতিত রাইবিনের সেই রক্তাক্ত মুখ। দুচোখ দিয়ে সমানে ঝড়ে পড়ে জল। বুড়োর কোনো কথারই জবাব তিনি দিতে পারেন না।

কিছুক্ষণ চুপ করে পায়চারি করার পর বৃদ্ধ সোজা মাকে জিজ্ঞাসা

করে,—'এখন বইগুলো নিয়ে কি করবেন, কিছু ঠিক করেছেন ?'

বুড়োর দিকে চেয়ে মা শান্তকণ্ঠে বলেন,—'আপনার হাতেই দিয়ে যাব।'

কিন্তু পরক্ষণেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন,—'বলেন, আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে, প্রতিবাদ করলে কুকুর-ছাগলের মতন মেরে জেলে আটকে রাখবে···'

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলে,—'সব শক্তিতো ওদের হাতে!'

মা তেমনি উত্তেজিত হয়েই বলেন,—'কিন্তু সে-শক্তি তারা পেলো কোথা থেকে ? আমাদের কাছ থেকেই তো ··তাদের যা কিছু শক্তি! এই ব্যবস্থার গোড়ায় রস জুগিয়ে চলেছিতো আমরাই···সেই রসে পুষ্ট হয়ে তারা আবার আমাদের ওপরেই করছে নির্য্যাতন···'

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ হতেই মা নীরব হয়ে গেলেন। তাতিয়ানা একজন তরুণ কৃষককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

কৃষকটি কোন রকম ভূমিকা না করেই মার কাছে গিয়ে বল্লো,—'আমার নিজের পরিচয় আমি নিজেই দিচ্ছি, আমার নাম পিটার··· আপনি ভয় করবেন না···আপনার বইপত্র আমি এইমাত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখে এলাম···আমি এ কাজের সব হদিসই জানি··· আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন···যা করবার, আমরাই করবো···'

লোকটির সহজ সরল ব্যবহারে মা মুগ্ধ হয়ে যান। গভীর রাত্রি পর্যন্ত মার সঙ্গে বসে পিটার আলোচনা করে। রাইবিনকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছে, যাক্, একটা রাইবিনের জায়গায় একশোটা রাইবিন গজিয়ে উঠবে!

পরের দিন ভোর না হতেই মা বিদায় নিয়ে গাড়ী করে আবার বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ী এসে কড়া নাড়তেই আইভানোভিচ দরজা খুলে দিলো।

—'একি···এত শিগ্‌গির কাজ সেরে ফিরে এলেন? আপনি দেখছি সকলকে ছাপিয়ে গেলেন···'

একটা গোপন গর্বে মার অন্তর দুলে ওঠে।

ঘরের ভেতর চেয়ে দেখেন, সমস্ত জিনিস-পত্র তছনচ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

আইভানোভিচ বলে,—'কাল রাত্তিরে সার্চ হয়ে গিয়েছে···ভাবলাম, বুঝি আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, কিন্তু শুধু শাসিয়ে গেল···আর পুলিশের হুকুমে আমার চাকরীটা খতম হয়ে গিয়েছে···আজ সকালেই অফিসে গিয়ে জানলাম, আমাকে আর তাদের দরকার নেই···'

সেই এলো-মেলো জিনিসপত্রের মধ্যে বসে মা তাঁর অভিজ্ঞতার সমস্ত কথা জানান।

আইভানোভিচ উল্লাসিত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—'আমার নিজের মাকে কখনো দেখিনি···কিন্তু আজ আপনাকে সত্যি মা বলে ভালবাসতে গর্বে মন ভরে উঠছে।'

মার কণ্ঠস্বর চাপাকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—'ওরে, আমি তোদের পেটে ধরিনি···কিন্তু আজ তোরা সবাই আমার ছেলে···আমার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে আমি তোদের ছাড়বো না···'

মা ঘর গোছাবার জন্যে হাত বাড়াতেই আইভানোভিচ বলে,—'মা, মিছে পরিশ্রম করছেন, আমার স্থির বিশ্বাস, আজ রাত্তিরে তারা আবার ফিরে আসবে। তারা একদণ্ডও আর আমাদের স্বস্তিতে থাকতে দেবে না···'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন,—'এই সময় পাভেল আর আন্দ্রিকে জেলের বাইরে আনতে পারলে খুব ভাল হতো···'

—'কিন্তু তা হবে না মা··পাভেল জানিয়েছে, আমাদের প্রস্তাবে সে রাজী নয়। জেল থেকে এখন সে পালাবে না। বিচারে যে-দণ্ড হয় তা সে নেবে···দণ্ড মানেতো সাইবেরিয়ায় নির্বাসন···সেইখান থেকে সে পালাবে···'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,—'সে যদি বোঝে তাতে আন্দোলনের কোন ক্ষতি হবে না···তাই হোক।'

মা যে এত সহজে এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারবেন, তা

আইভানোভিচ ভাবতেই পারে নি। আইভানোভিচ খুশী হয়ে বলে,—'এখন আমাদের একটা জরুরী কাজ করতে হবে···রাইবিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখুনি একটা ছোট বই লিখে ফেলছি···সেটা তাড়াতাড়ি করে ছাপিয়ে লোকের মধ্যে প্রচার করতে হবে···'

আইভানোভিচ কালি-কলম নিয়ে লিখতে বসে। মা ঘরের কাজে মন দেন। ঘণ্টা খানেক পরে আইভানোভিচ লেখা কাগজগুলো মার কাছে দিয়ে বলল,—'এগুলো আপনার জামার তলায় বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে দিন···মনে রাখবেন, এখুনি হয়ত পুলিশ সার্চ করতে আসতে পারে!'

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে উপস্থিত হলো, খবর দিলো কাল রাত্তিরে সাত আট জায়গায় খানাতল্লাসী হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার অবশ্য এসেছিল আইভানের জন্যে, কিন্তু শুনলো একটু সেরে উঠতে না উঠতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। এতক্ষণ হয়ত কোন গাঁয়ে গাছের তলায় আগুন জ্বেলে চাষীদের বই পড়িয়ে শোনাচ্ছে।

ডাক্তার শুনে তো অবাক!

—'বল কি হে, মাথার খুলিতে যে আঘাত তার লেগেছিল, এখনো তাকিছুই সারেনি—তাই নিয়ে সে পড়বে বই —কি সাংঘাতিক ব্যাপার!'

আইভানোভিচ বলে,—'আমিও তাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু কোন কথাই সে শুনলো না, বল্লে,—একবার যখন পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি, তখন কি আর শুয়ে থাকি! কিন্তু বন্ধু শিগ্‌গির শিগ্‌গির এখান থেকে সরে পড়—শুনছি, আজ রাত্তিরে নাকি এখানে পুলিশ হানা দেবে—'

তার পর মার দিকে চেয়ে বলে,—'ভালই হয়েছে, মা কাগজগুলো ডাক্তারকে দিয়ে দিন—ও লুডামিলাকে দিয়ে দেবে—'

লেখা কাগজগুলো নিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে পড়লো! আইভানোভিচ আর মা বসে গল্প করেন, কান পড়ে থাকে দরজার কাছে—কখন সেখানে ভারি বুটের আওয়াজ ওঠে।

গভীর রাত্রিতে দুজনেই কখন ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখনো ভোর হয়নি—আধোঅন্ধকারে তখনো পথঘাট ঢাকা। ঘুমের মধ্যে মার যেন মনে হলো কে যেন ডাকছে! ঘুম ভেঙে গেল, কান খাড়া করে শোনেন, রান্নাঘরের জানালায় কে যেন টোকা মারছে! মা আস্তে আস্তে সেই দিকে এগিয়ে যান। ক্রমাগত টোকা পড়তে থাকে।

মা জিজ্ঞাসা করেন,—'কে?'

চাপা গলায় উত্তর আসে,—'দরজাটা খোলেন মা-ঠাক্‌রেন··· শিগ্‌গির খোলেন—'

মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই দেখেন, সর্বাঙ্গ কাদায় ভরা ইগনেটি —মনে পড়ল রাইবিনের গাঁয়ে তাকে দেখেছেন।

—'কি ব্যাপার?'

এক-পা কাদা নিয়ে ইগনেটি ভেতরে ঢুকে বলে,—'বড় বিপদ—আমাদের গাঁয়ে বড় বিপদ—'

—'সে কথা আমি জানি—'

—'আপনি? কি করে জানলেন এর মধ্যে?'

আইভানোভিচ এসে পড়লো। নতুন লোক দেখে, ভয়ে ইগনেটী থতমত খেয়ে গেল। আইভানোভিচ বুঝতে পেরে কাছে গিয়ে সস্নেহে বলে,···'ভয় নেই কমরেড···তোমার পা দেখছি ক্লান্তিতে কাঁপছে··· বসো···'

ইগনেটী পায়ের ন্যাকড়ার পটির ভেতর থেকে ছোট একটা চিঠি মার হাতে দেয়। ধরা পড়বার সময় রাইবিন তাড়াতাড়ি লিখেছে··· রাইবিন লিখেছে—'মা, আমার অনুরোধ, এ গাঁয়ে কাজ যেন বন্ধ না হয়···এর যোগ্য উত্তর দেওয়া চাই···প্রত্যেক চাষীর কাছে বই পৌঁছে দিতে হবে···আমার শেষ অনুরোধ'—রাইবিন।

মা চিঠিটা আইভানোভিচের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে এক বালতি গরম জল নিয়ে আসেন। ইগনেটীর সামনে এসে মা আদেশ করেন,—'দেখি ইগনেটী, তোমার পা-টা?'

ইগনেটী বুঝতে পারে, এই বৃদ্ধা নিজের হাতে গরম জল দিয়ে তার পা ধুয়ে দিতে এসেছে। বিহ্বল হয়ে সে বলে ওঠে,—'একি, একি



করছেন মা?

সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলের মতন পা দুটো বেঞ্চির তলায় লুকোতে চেষ্টা করে আর কাতরভাবে বলে,—'না, না মা, এ কখনো হয় না! না—না।'

আইভানোভিচ লক্ষ্য করলো ক্লান্তিতে তখনো ইগনেটার' পা কাঁপছে। স্পিরিট দিয়ে ঘষে দেওয়া দরকার। স্পিরিট আনবার জন্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইগনেটা সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে মাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে,—'ভদ্রলোক না?

মা বুঝতে পারেন ইগনেটার মনের কথা। জবাব দেন,—'আমাদের এখানে বাছা ভদ্রলোক ছোটলোক কেউ নেই, আমরা সবাই কমরেড!'

ইগনেটা সন্দেহে ঘাড় নেড়ে বলে,—'ঠিক বুঝতে পারি না মা-ঠাকরুণ!'

—'কি বুঝতে পার না?'

—'একদিকে দেখি, এই ভদ্দরলোকেরাই আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে,—চাবুক মারছে, আবার একদিকে দেখি এই ভদ্দরলোকরাই আমার মতন চাষীর পা ধুয়ে দিচ্ছে···এর মাঝখানে যে কি আছে, তা বুঝতে পারি না!'

আইভানোভিচ স্পিরিট নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। ইগনেটির কথার উত্তর সে-ই দেয়,—'এর মাঝখানে একজাতের ভদ্রলোকই আছে, যারা তোমাদের রক্ত চুষে খেয়েই বেঁচে থাকে···'

শ্রদ্ধাভরে আইভানোভিচের দিকে চেয়ে ইগনেটী বলে,—'ঠিক বলেছ কর্তা।'

আইভানোভিচের মালিশের ফলে ইগনেটী আবার সহজ হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো।

—'কি বলে যে ধন্যবাদ দিতে হয়, তা তো জানি না কর্তা, এখন বেশ আরাম বোধ হচ্ছে, এখন ঠিক আবার হাঁটতে পারব।'

মা খাবার টেবিলে ইগনেটীকে গাঁয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইগনেটী বলে,—'আমিইতো ঐ সব বই লোকের দরজায় দরজায় বিলি করি···পুলিশ দেখলে কিন্তু মা বড় ভয় করে, গাঁয়ে যা পুলিশের উৎপাত হয়েছে।'

মা হেসে বলেন,—'কিন্তু রাইবিন সম্বন্ধে একটা ছোট বই যে বিলি করতে হবে?'

—'তা করতে পারবো। তাতে আর অসুবিধার কি হয়েছে?'

মা হেসে বলেন,—'কিন্তু এই যে বললে পুলিশকে বড় ভয় করে।'

ইগনেটী খুব লজ্জায় পড়ে গেল!

—'তা সত্যিই ভয় করে মাঠাকরুণ, তাই বলেছি। তা বলে যে কাজ করবার, তাতো করতেই হবে? আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে কার না ভয় করে বলো? তবুও দরকার হলে ঝাঁপিয়ে তো পড়তেই হয়।'

ইগনেটীকে আর গাঁয়ে ফিরে যেতে হলো না। নিকোলের সঙ্গে তাকে আপাতত এক বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হলো।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আইভানোভিচ খবর নিয়ে এলো

পাভেলের বিচারের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ সেই খবরটা শুনে মা পাথরের মত স্থির হয়ে গেলেন।

আইভানোভিচ বুঝতে পেরে বলে,—'এতে ভয় পাবার কি আছে? বিচার যত শিগ্‌গির হয়ে যায় ততইতো ভালো। আপনাকে আমরা কথা দিচ্ছি, দেখবেন সাইবেরিয়াতে যাওয়ার পথেই ওকে আমরা উদ্ধার করে আনবো!'

স্বাভাবিক উদ্বেগে ও স্নেহে মা বলেন,—'হ্যাঁ বাবা, এক কাজ করলে হয় না! বিচারের দিন আমি যদি জজের কাছে তার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি?'

আইভানোভিচ লাফিয়ে ওঠে।

—'বলেন কি মা? আপনি যদি এই ভাবে ক্ষমা চান, তাহলে সব চেয়ে রেগে যাবে পাভেল নিজে। এতে যে আমাদের ভীষণ ছোট করা হয় মা।'

মা লজ্জিত হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন তাঁর মনের ভয় অতর্কিতে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

—'সত্যি বাবা, কিছু মনে করো না···বাইরে যতই সাহস দেখাই না কেন, মনের ভেতর কোথায় যেন একটা ভয় এখনো লুকিয়ে আছে··· কিছুতেই তাকে আর দূর করতে পারছি না!'

আইভানোভিচ নানাভাবে আবার মাকে বোঝাতে আরম্ভ করেন। ঠিক হলো, বিচারের দিন মা আদালতে যাবেন।

•

আদালত আজ লোকে লোকারণ্য। আদালতের ভেতর আগে থাকতেই লোক আসন নিয়ে বসেছে। মা খুঁজতে খুঁজতে একটা খালি আসন পেয়ে বসলেন। বসে দেখেন, তাঁর পাশের আসনে একজন স্ত্রীলোক বসে তাঁর দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে। মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলে,—এই মেয়েছেলেটার ছেলের জন্যেই তো আমার ছেলেটাও উচ্ছন্নে গেল! মা চিনতে পারলেন, পাভেলের একজন সঙ্গী



মাযরুনভ,—এই স্ত্রীলোকটি হলো তার মা। বুড়ো সিজভ কাছেই বলেছিল। মাযরুনভের মাকে ধমকে বলে উঠলো,—'ছিঃ, নাতালিয়া। ওসব কথা এখানে কেন?'

মা ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে আদালত-ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখেন। বিচারকের আসনের ঠিক ওপরে দেয়ালে টাঙানো সর্বশক্তিমান জারের এক প্রকাণ্ড ছবি। সকালবেলাকার সূর্যের আলোয় ছবিটার সোনালী ফ্রেম ঝিকমিক করছে। এমন সময় ভেতরের পর্দা ঠেলে একজন লোক গম্ভীরকণ্ঠে কি সব বলে গেল, তার এক বর্ণও মা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু দেখলেন, লোকটার কথা শেষ হতে না হতেই আদালত শুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে উঠলো। মা কি করবেন, ঠিক করতে না পেরে বসেই ছিলেন। সিজভ তাড়াতাড়ি মার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো। বাঁ দিকের দেওয়ালের একটা দরজা খুলে গেল···একজন বুড়ো লোক, সর্বাঙ্গে কালো সিল্কের আবরণ, কারুর দিকে না চেয়ে সামনের উঁচু চেয়ারে গিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন লোক গম্ভীর হয়ে

সেই আসনের পেছনে এসে দাঁড়ালো। মা বুঝলেন, ইনিই বিচারক। এঁরই ওপর তাঁর ছেলেদের জীবনমরণ নির্ভর করছে।

বিচারকের আসন গ্রহণ করার পর যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সকলেই যে যার আসনে আবার বসে পড়লো। এমন সময় সিজভ মার কানে কানে বল্লো,—'ঐ দেখ!'

মার সারাদেহ চমকে উঠলো। দেখেন, ডানদিকের দেয়ালে তারের বেড়া দিয়ে খাঁচার মত একটা ঘর। সেই ঘরের ভেতর, কারা যেন ঢুকছে। মা ভাল করে চেয়ে দেখেন, খোলা তলোয়ার হাতে একজন সৈনিক এসে প্রথমে ঢুকলো, তার পেছনে পেছনে, হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধা অবস্থায় এসে ঢুকলো পাভেল, আন্দ্রি, ফিদিয়া, সাময়লভ, আরো অনেক ছেলে। পাভেল খাঁচার ভেতর থেকে চারদিকে চেয়ে দেখতেই মার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। হেসে মাথা নত করে পাভেল মাকে অভিবাদন জানালো। তাই দেখে, আন্দ্রি পাভেলকে মুখ ভেংচে উঠলো। মা অবাক হয়ে যান, এরা মরতে চলেছে অথচ এতটুকু ভয় ভাবনা নেই···এদের দেখে মনে হয়, যেন এরা নিজেদের ঘরের বৈঠকখানাতেই বসে আছে। তারা মনের আনন্দে, নিজেদের মধ্যে কি সব আলাপ করে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। তাদের হাসিতে আদালতের সেই গুমোট ভাবটা যেন কেটে যায়।

বুড়ো সিজভ মার কানে কানে বলে,—'দেখেছ পেলাগয়া, ছোঁড়াগুলো কি রকম শক্ত হয়েছে! বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই! সাবাস্!'

এমন সময় সামনে থেকে একজন লোক চীৎকার করে বলে উঠলো, —'চুপ কর সবাই!'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর নীরব হয়ে গেল।

বিচারক আসামীদের খাঁচার দিকে চেয়ে চোখ না তুলেই বিড় বিড় করে কি বল্লেন, মা কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করেও বুঝতে পারলেন না। দেখলেন, পাভেল এগিয়ে এসে বিচারকের কথার জবাব দিতে লাগলো। তার কথার শান্ত সুর, শান্ত গম্ভীর ভঙ্গী দেখে মা অবাক হয়ে যান। এতটুকু উত্তেজনার কোন লক্ষণই তিনি পাভেলের কথার

মধ্যে খুঁজে পান না। পাভেলের কথা শেষ হতে না হতেই একজন সুসজ্জিত লোক উঠে দাঁড়িয়ে বিচারককে কি সব বল্লো, মা যতটুকু বুঝতে পারলেন, তাতে তাঁর মনে হলো, লোকটি সরকারী উকিল, তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ করছে।

সরকারী উকিলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনচার জন উকিল সেই খাঁচার কাছে এসে পাভেলের সঙ্গে যেন কি সব যুক্তি করতে লাগলো। এমন সময় পাভেলের স্পষ্ট কণ্ঠস্বর মার কানে এলো, এবার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সেই শান্তসুর আর নেই। পাভেল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—'এখানে বিচারক আর আসামী দুটো আলাদা শ্রেণী বলে কিছু নেই। এখানে আছে শুধু শত্রু আর মিত্র···বাদী আর বিজেতা!'

পাভেলের কথায় মার ভেতরটা যেন শুকিয়ে উঠলো। মনে মনে ভগবানকে ডাকেন, দোহাই ভগবান, পাভেল যেন রেগে না যায়!

এমন সময় বিচারক আন্দ্রিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন,—'আন্দ্রি নাখোদকা, তুমি কি তোমার অপরাধ স্বীকার করছো?'

আন্দ্রি তখনো বসেছিল। কে একজন সঙ্গী তাকে ঠেলে তুলে দিল। পরমানন্দে গোঁফে মোচড় দিতে দিতে আন্দ্রি এগিয়ে এসে বলে,—'অপরাধ স্বীকার? কোন অপরাধই আমি করিনি মহাশয়, তা স্বীকার করবো কি? কাউকে খুনও করিনি, কারুর সম্পত্তিও চুরি করিনি। যে সামাজিক জীবনধারার মধ্যে থাকলে মানুষ খুনে আর চোর হতে বাধ্য হয়, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েছি সেই জীবনধারাকে বদলাবার জন্য··· নিজেকে সেই পাপ-জীবন-ধারার সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতেই সব সময় চেষ্টা করেছি···'

বিচারক রেগে গর্জে উঠলেন,—'তোমার ঐ মেঠো বক্তৃতা আমি শুনতে চাই না···শুধু বলো, হ্যাঁ, কি না!'

বিচারকের সেই কথাকে তুচ্ছ করবার জন্যেই আন্দ্রি তার পাশের সঙ্গীকে হেসে বলে,—'ফিডর, আমার হয়ে তুমি এর জবাব দিয়ে দাও ভাই!'

ফিডর এগিয়ে এসে চীৎকার করে ওঠে,—'আমাদের একমাত্র জবাব



[illegible], কি অধিকারে [illegible] ঐ বিচারকেরা আমাদের বিচার করবেন?

বিচারক বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে কি সব লিখছিলেন। সরকারী উকিল উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করে দেন। মা দেখলেন, বিচারক সে-বক্তৃতাও কিছু শুনছেন না। তিনি আপনার মনে কি যেন খস্ খস্ করে লিখে যাচ্ছেন।

প্রধান বিচারককে সাহায্য করবার জন্যে আরো দুজন বিচারক এসে বসেছিলেন। মা বার বার তাঁদের দিকে চেয়ে দেখেন। তাঁদের মুখের চেহারা এবং ভাব-ভঙ্গী দেখে মা স্পষ্ট বুঝতে পারেন, তাঁরা যেন ভীষণ ক্লান্ত, অবসন্ন আর অসুস্থ। আদালতে উকিল বা আসামী কি বলছে, তা মন দিয়ে শোনবার তাঁদের যেন কোন দরকার নেই। তাঁদের সারা মুখের রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা চরম বিরক্তি!

দুপুরের টিফিনের পর আবার আদালত বসলো। খাঁচার ভেতর বসে আসামীরা মনের আনন্দে গল্প করে চলে, যেন আদালতের কাজ-কারবারের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই।

উকিলদের পালা আর বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে পাভেলকে তার কথা [illegible] দেওয়া হলো। পাভেল শান্তকণ্ঠে বলে,

—আমি এই আদালতের কোন অধিকারকেই স্বীকার করি না,—তাই নিজেকে সমর্থন করে এখানে কোন কথাই বলতে চাই না। আমি যে আদালতকে স্বীকার করি, সে-আদালত আজও গড়ে ওঠে নি… জনগণের আদালত…আমাদের সাধনা হলো সেই জনগণের আদালতকে প্রতিষ্ঠিত করা।

—আমরা সাম্যবাদী। তার মানে, আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর এই জাত আর লোভের [illegible] নেশার শত্রু। আমরা বুঝেছি, এই ব্যক্তিগত টাকা জমাবার নেশাই আজ সভ্য মানুষকে পশুর সীমায় নিয়ে এসেছে…এক দল শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জমিদারের অন্ধ স্বার্থের ওপর পৃথিবীর আর সমস্ত লোকের কল্যাণ নির্ভর করছে। এবং সেই অর্থ-[illegible] দল নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখবার জন্যে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধায়, যারা [illegible] প্রবঞ্চনায় সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সাধারণ

মানুষকে অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের ভেতর রাখে,—মানুষকে তারা দেখে শুধু টাকা রোজগারের যন্ত্র হিসাবে। আমরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙবো, নিয়ে আসবো এমন এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের এই পৃথিবীতে মানুষ আর শাস্তি পাবে না, অত্যাচারিত হবে না।

—আমরা মজুর, আমরা শ্রমিক, আমাদের পরিশ্রমে তৈরী হয় আজকের সভ্যতার সমস্ত জিনিস। ছোট খেলনা থেকে আরম্ভ করে জাহাজ কামান। আমরাই ঐশ্বর্য্য উৎপাদন করি কিন্তু সে ঐশ্বর্য্যের ওপর নেই আমাদের কোন অধিকার। আমরা চাই, জগতের প্রত্যেক মানুষকেই পরিশ্রম করতে হবে···এবং সেই পরিশ্রম দিয়ে যে-ঐশ্বর্য্য তৈরী হবে, তাতে প্রত্যেক মেহনতী মানুষের থাকবে অধিকার। এই হলো আমাদের মূল কথা! এর মধ্যে আপনারাই বলুন—আমাদের অপরাধ কোথায়?'

বিচারক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠেন,—'এই থামো! থামো বলছি!'

পাভেল ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলে,—'আমরা সেইদিনই থামবো, যেদিন মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে—থামবো সেদিন, যেদিন মেহনতী মানুষ পাবে তার মেহনতের মর্য্যাদা! আজ একদল স্বার্থান্ধ লোভী মানুষ পৃথিবীর সব মানুষকে নানা দেশে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাদের টাকা-রোজগারের সুবিধার জন্যে, তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। যেদিন পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনসাধারণকে বোঝাতে পারবো এই লাভ আর লোভের ষড়যন্ত্রের কথা, সেইদিনই আমরা থামবো, তার আগে নয়!

সমস্ত আদালত নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বেজে ওঠে পাভেলের শেষ কথা,

—এই আজ আমি আপনাদের সামনে বলে যাচ্ছি, সেই মহাদিন সামনেই আসছে, যেদিন জগতের সব দেশের লোক এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে,—জয় হোক মানুষের!'

এই বলে পাভেল নীরবে গিয়ে পেছনে দাঁড়াতেই আন্দ্রি এগিয়ে

এলো। বিচারকদের দিকে চেয়ে আন্দ্রি হেসে উঠলো!

একজন বিচারক গর্জে উঠলেন,—'থামো! কোন বাজে কথা আমরা আর শুনতে চাই না।'

আন্দ্রি হেসে বলে,—'বাজে কথা এসব নয় স্যার—সব সত্যি কথা—ধরুন,—আপনাদের সামনে দুটো দল আছে। একদল কেঁদে বলছে, ওরা আমাদের সব হাতিয়ে কেড়ে নিয়েছে,...অপরদল বলছে, বেশ করেছি, আমাদের হাতিয়ার আছে তাই হাতাবার অধিকারও আছে...'

—'থামো! একদম চুপ! আমরা এখানে কোনো বাজে গল্প শুনতে আসি নি!'

আন্দ্রি তেমনি হেসে বলে,—'কেন, বুড়ো লোকদের তো গাল গল্প শুনতে ভালই লাগে?'

—'বন্ধ কর তোমার এই ভাঁড়ামী? নইলে ..'

একে একে অন্য আসামীদের ডাক পড়ে। শেষকালে ডাক পড়লো সাময়লভের। সে এগিয়ে এসে যেন ফেটে পড়লো; চীৎকার করে বল্লো,—'তোমাদের হাতে যত শাস্তি আছে দাও—সাইবেরিয়ায় যতদূর নির্বাসন করতে পার,—করো,—আমরা আবার ফিরে আসবো! নিশ্চয়ই আসবো,—তোমাদের এই ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে।'

সৈনিকরা বেয়নেট তুলে হেঁকে উঠলো। আদালত আবার নিস্তব্ধ হলো।

সিজভ মার কানে কানে বলে,—'এইবার বিচারের রায় দেবে।'

মার সমস্ত শরীর যেন ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। তিনি দেখলেন, প্রধান বিচারক একটা কাগজ থেকে বিড় বিড় করে কি সব পড়ছেন। তার এক বর্ণও মা বুঝতে পারেন না!

সিজভ মার কানে কানে বলেন,—'নির্বাসন!'

শুষ্ককণ্ঠে মা বলেন,—'সেত আমি জানতাম!'

বিচারকেরা উঠে গেলেন। আসামীদের আত্মীয়েরা সেই তাদের খাঁচার কাছে ছুটে এলো। মাও ধীরে ধীরে সেই খাঁচার কাছে এগিয়ে এলেন! কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলেন না, শুধু নীরব দৃষ্টি

দিয়ে পাভেল, আন্দ্রি, আর তাদের সঙ্গীদের তিনি যেন স্নেহ চুম্বন করলেন। মনের মধ্যে জেগে ওঠে একটা তীব্র বাসনা, যদি—একবার,—শুধু একবার, ওদের বুকের কাছে পাওয়া যেতো!

কয়েক মিনিট পরে সৈনিকেরা খাঁচার ভেতর থেকে আসামীদের টেনে নিয়ে চলে গেল। মার মনে জেগে ওঠে মহানীরবে এক প্রশ্ন,—কোথায় নিয়ে গেল?

বিহ্বলের মতন মা রাস্তায় এসে দাঁড়ান। চারদিকে কথা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। মার কানে যেন কোন আলোচনাই এসে পৌছয় না!

হঠাৎ একদল ছেলে আর মেয়ে মার সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে,—'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার হাতটা আমরা একবার স্পর্শ করবো! আপনার ছেলে পাভেল আমাদের আদর্শ।'

মা আবিষ্টের মতন তাদের সঙ্গে করমর্দন করেন।

পেছন থেকে হঠাৎ সমবেত কণ্ঠে জেগে ওঠে চীৎকার···'দীর্ঘজীবী হোক্ বিপ্লব ··সারা পৃথিবীর মজুরদের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক···'

দেখতে দেখতে সেই চীৎকার যেন আরো তীব্র আরো ব্যাপক হয়ে ওঠে। যেন চারদিক থেকে শব্দের ধারা মহা-কলরবে এক সাগরের মোহনায় এসে পড়ছে!

—'দীর্ঘজীবী হোক্ বিপ্লব!'

—'দীর্ঘজীবি হোক শ্রমিকদের ঐক্য!'

—'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! শ্রমিক কৃষকদের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক! শোষণ নিপীড়ণ নিপাত যাক!'

আবিষ্টের মতন মা দাঁড়িয়ে পড়েন।

তাঁর মনে হলো, কাছাকাছি যেন কোথায় সব লোক জড় হচ্ছে। কানে এলো, কে যেন বলছে,

—'শোন কমরেডরা, একটা রাক্ষস আজ রাশিয়ার বুকে চেপে বসে রক্ত পান করছে, তার নাম হলো স্বেচ্ছাতন্ত্র···স্বৈরতান্ত্রিক···একজনের ইচ্ছায়, একটি পরিবারের সুখের জন্য···'

সিজভ এসে মার হাত ধরে বলে,—'চল, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দি!'

নিজেই হাত ধরে মাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় আইভানোভিচ বাইরে থেকে এসে দেখে, ঘরের ভেতর দুটী নারী নীরবে মুখোমুখি বসে আছে, মা আর শাশাকা।

শাশাকাকে দেখেই আইভানোভিচ বলে ওঠে,—'শাশাকা, আমার অনুরোধ তুমি আর এখন এখানে এসো না···এক মুহূর্ত দেরী করো না···পালাও···মনে হচ্ছে, আজ রাত্রিতে আমিও বোধ হয় ধরা পড়বো···তোমাকে অন্তত বাইরে থাকতেই হবে···'

তারপর মার কাছে এসে বলে,—'মা আপনিও এখনই বেরিয়ে পড়ুন··· আমি শুনলাম, আপনাকেও ওরা ধরবে।'

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—'আমাকে ধরবে ? কেন ?'

—'এ কেন-র কোন জবাব নেই ! আপনাকে আর জেলের বাইরে রেখে ওরা নিরাপদ বোধ করছে না।'

আপনি সোজা লুডমিলার ওখানে যান···এই নিন্ পাভেলের শেষ বক্তৃতা···যেমন করেই হোক্, ওটা ছাপিয়ে বিলি করতে হবে।'

মার সমস্ত দেহ-মন যেন নিমেষের মধ্যে সব অবসাদ ভুলে যায়। উঠে দাঁড়ান···পাভেলের অসমাপ্ত কাজকে তিনি সম্পূর্ণ করবেনই···

পাভেলের বক্তৃতার পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে তিনি অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়েন।

লুড্‌মিলার সঙ্গে সারারাত জেগে মা পাভেলের বক্তৃতা ছাপিয়ে ফেলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যাবেন···দেশ দেশান্তরে যাবেন···পাভেলের কথা তিনি সারা জগতে ছড়িয়ে দেবেন···

সমস্ত কাগজগুলো জামার তলায় লুকিয়ে নিয়ে মা লুড্‌মিলার কাছে বিদায় নেন। বিদায়ের কালে মার মুখের দিকে চেয়ে লুড্‌মিলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মা জিজ্ঞাসা করেন,—'কি দেখছো মা ?'

লুড্‌মিলা বলে,—'মা, আজ তোমার মুখে যেন দেখছি নতুন

সূর্যোদয়···রাশিয়ার নব-সূর্যোদয়···পৃথিবীর নব-সূর্যোদয় !'

—'বিদায় !'

গ্রামে যাবার জন্যে মা ষ্টেশনে এসে রাত্রির গাড়ীতেই উঠে বসলেন। গাড়ীতে ওঠবার সময়, কেন যেন তাঁর মনে হলো, তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো কারা সেই গাড়ীতে উঠলো।

এক-এক ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামে আর মার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে, এই বুঝি তারা এসে পড়ে।

কয়েকটা ষ্টেশন পড়ে গাড়ী থামতেই, গাড়ীর ভেতর থেকে একজন লোক প্লাটফর্মে নেমে গেল। মা নীরবে লক্ষ্য করেন। দেখেন, প্লাটফর্মের ওপর আর একজন লোক যেন আগে থাকতে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সঙ্গে কানে কানে এর যেন কি কথা হয় !

লোক দু'জন জানালার কাছে এগিয়ে এসে কটমট করে মার চোখের দিকে চেয়ে থাকে। নিদারুণ অস্বস্তিতে মা বলেন,—'ওরকম করে চেয়ে আছ কেন বাছা ?'

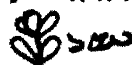
সামনের একজন লোক দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে,—'বুড়ি হয়ে মরতে বসেছিস্···তবুও চালাকী···শয়তানী···চোর···'

তারপর দুজনে চীৎকার করে বলতে থাকে ঐ যে চোর···চোর··· পালিয়েছে···ধর ধর···

মা বুঝতে পারেন, যে মুহূর্তের অপেক্ষায় তাঁর বুক এতক্ষণ কাঁপছিল, সেই মুহূর্ত এসে গিয়েছে !

গায়ের আবরণ-স্বরূপ একটা চাদর নিয়েছিলেন। চাদরটা খুলে ফেলে মা ট্রেন থেকে নেমে এগিয়ে আসেন, জামার ভেতর থেকে ছাপানো কাগজগুলো নিয়ে ষ্টেশনের চারদিকে ছড়িয়ে দেন। তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠেন,—'আমি চোর নই···আমি পালাচ্ছি না···'

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে লোক এসে জড় হয়। তাদের ডেকে অকম্পিত কণ্ঠে মা বলেন,—'কে কোথায় আছ, শোন ! আমার





ছেলে···পাভেল···তাকে ওরা নির্বাসনে পাঠিয়েছে···এই তার শেষ বক্তৃতা···

তোমাদের কাছে এই তার শেষ কথা···আমি তার মা, এসেছি তার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।'

চারদিকে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, সেই কাগজ নেবার জন্যে।

—'এই হটো! হটো!' পুলিশরা লোকজন সরিয়ে দিতে লাগলো।

মা সবাইকে ডেকে আবার বলতে শুরু করেন,—'পাভেল যা বলে গিয়েছে, তার প্রত্যেকটা কথা সত্যি···শুধু তোমরা সকলে একত্র হয়ে···'

—'এই চুপরও!' পুলিশটা মার হাত চেপে ধরল্।

এমন সময় আর একজন পুলিশ এসে মার জামা ধরে ঝাঁকানি দিল···কোন রকমে টাল সামলে নিয়ে মা বলে উঠলেন,—'ওরা এই রকম করে···করবে নির্য্যাতন, পাঠাবে নির্বাসনে···কিন্তু ভয় করো না···কোন ভয় করো না···সত্যের জয় হবেই···পৃথিবীর সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষেরা এক হয়ে এর জবাব দেবে।'

এমন সময় আর একজন পুলিশ এসে মাকে সজোরে টান দিতে মা পড়ে গেলেন। মা আবার কথা বলতে সুরু করতেই, দুদিক থেকে চড় এসে পড়লো তাঁর গালে, পিঠে পড়লো রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি। সেই প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল···কারা যেন তাঁকে ধাক্কা মারছে···মাথায় ঘাড়ে মুখে পিঠে আঘাত করছে···

তিনি চোখে কিছু দেখতে পান না, রক্তে মুখ চোখ ভেসে যায়।

অস্ফুট কণ্ঠে মা বলে চলেন—

—'মৃত্যুকে পার হয়ে এসেছে যে সত্য···কেউ তাকে পারবে না চুপ করাতে···বিপ্লব দীর্ঘজীবি হবে।'

মার মনে হলো—যেন তিনি কোথায় চলেছেন, কানে আসে অস্পষ্ট একটা দরজা খোলার শব্দ···তবুও মা বলে চলেন,

—'ওদের সহস্র অত্যাচার পারবে না রোধ করতে···রক্তের নদীর

তার ফুল হয়ে ফুটে উঠবে এই সত্য···সমস্ত অত্যাচার নিপীড়নের দিন শেষ হবেই।'

কে যেন চীৎকার করে বল্লে,—'চুপ কর বুড়ি। এই, কেউ ওর মুখটা বন্ধ করে দে···'

তার মুখে হাতে এসে পড়ে প্রচণ্ড লাঠির আঘাত—

—'ওরে নির্বোধের দল,—যে পাপের, বিদ্বেষের বোঝা তোরা নিজেরা জমিয়ে তুলেছিস—তারই চাপে পড়ে একদিন মরবি তোরা।'

কোথা থেকে সজোরে একটা রাইফেলের কুঁদোর প্রচণ্ড আঘাত তাঁর বুকে এসে লাগলো ··শুধু একবার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো—'ওরে ওরে, হতভাগ্যের দল!'

তার মনে হলো, কে যেন জোরে তার গলা টিপে ধরেছে! তিনি আর কথা বলতে পারছেন না। সব যেন অন্ধকার হয়ে আসছে······ ··

